প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ২০২২

অনুভব দাশগুপ্ত (বয়স ১৭)

১৪২৯ : প্রবাস বন্ধু : শারদীয়া সংখ্যা : সূচীপত্র : 2022

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	4
গদ্য		
পঞ্চাশোর্ধ্ব বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্বে নজরুল প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	5
মানুষের সংস্পর্শে মন্ত্রসিদ্ধ কবি	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	12
বৃষ্টিদিনের হর্স ওয়াগন	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	17
রানীকাহিনী	সংগ্রামী লাহিড়ী (পারসিপ্যানি, নিউ জার্সি)	20
উপমানব নিয়্যান্ডারথ্যাল	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	23
বোধন	অদিতি ঘোষদস্তিদার (মরিস প্লেইনস্, নিউ জার্সি)	29
শেষ নাহি যে	মৌ পাল (গোল্ডেন, কলোরাডো)	31
অমল মহিমা লয়ে তুমি এলে অরুণ প্রভাতে মন ছুঁয়ে গেলে	অনিন্দিতা রায় (মেসন, ওহাইও)	34
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে আমেরিকায় কাজিন গ্রুপের মিলনমেলা	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	36
অথ ট্রেনঘটিত	হৈমন্তী ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	39
এক পশলা বৃষ্টি	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	41
টাকুয়ামেনন	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	62
বাগবাজারের কথা	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	65
মলাট	অযান্ত্রিক (কলকাতা, ভারত)	68
শ্রী নারায়ণ সাউ	রুমকি দাশগুপ্ত (হিউস্টন, টেক্সাস)	70
স্মৃতিটুকু থাক	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	73
চিংড়ি	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	75
সারপ্রাইজ	নন্দিতা ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	76
ত্রিবেণী	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	77
বুনো সুবাস	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	88
মেক-আপ আর্টিস্ট	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	90
কবিতা		
আগমনীর সুরে	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	45
মনসঙ্গীত	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	45
সমাপ্তি, কথা, কবিতা	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	46, 47
পিকনিক	বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় (পুরুলিয়া, ভারত)	48
কলম তুমি, একটি ফোনালাপ	ওলে সোয়িঙ্কা ~অনুবাদ: সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	48, 49
আমার আর কবি হওয়া হ'ল না, ইচ্ছা করে, বিপদ	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	50
একলা, আশ্বিন	শান্তনু মিত্র (কলকাতা,ভারত)	51
অবয়ব, ইতিহাস	বাপন দেব লাড়ু (মেদিনীপুর, ভারত)	52
মুহূর্তের সংজ্ঞা	দীপশিখা চক্রবর্তী (কলকাতা,ভারত)	52
আয়না, শাড়িতে নারী	অমিত দে (হিউস্টন, টেক্সাস)	53
নিবারণ চক্রবর্তী, খোকার স্কুল	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	54, 55
বুনো ফুল আমার বিশ্বাস	সৌমি জানা (বেলমিড, নিউ জার্সি)	56
উঠে এসো অন্ধকূপ থেকে	নার্গিস পারভিন (মুম্বাই, ভারত)	57
জলটুঙি মন	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা,ভারত)	57
নীলাঞ্জন	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	58
ভাসিয়ে দাও	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	58
খেলা, নিখোঁজ	দীপান্বিতা সরকার (মুম্বাই, ভারত)	59
জীবনের গান, কষ্টিপাথর	নমিতা রায়চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	60
কেন চাও বুড়ো হতে, উন্নত রাখো শির	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	61

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন ১৪২৯, অক্টোবর ২০২২

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র:

অনুভব দাশগুপ্ত (বয়স ১৭)

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

অসিত কুমার সেন

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাই, প্রবাস বন্ধুর দীর্ঘদিনের সদস্য (১৯৯২-২০১৪) এবং পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিমান দাস গত ৫ই মে, বৃহস্পতিবার সকালে পরলোকগমন করেছেন। প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।
তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ভগবন্তী দাস ও পুত্র বরুণ দাসসহ বিমানদার অন্যান্য ভাইবোন এবং তাঁদের পুরো পরিবারের প্রতি প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে সমবেদনা জানাই।

পয়লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় তাঁর জন্ম হয়। ১৯৫০-এর দশকে তাঁদের পরিবার চলে আসেন কলকাতায়। সেখানে তাঁর স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নীল রতন সরকার মেডিকেল কলেজ' থেকে ১৯৫৯ সালে তিনি মেডিকেল ডিগ্রি অর্জন করেন।
তারপর চলে যান ক্যানাডার অটোয়াতে সিভিক হাসপাতালে রোটেটিং ইন্টার্নশিপ এবং রেসিডেন্সি করতে।
এর পর কয়েক বছর ইংল্যান্ডে বাস করেন। সেখানে তাঁর ডাঃ ভগবন্তীর সাথে পরিচয় হয়।
১৯৬৭ সালে তিনি 'বেইলর কলেজ অফ মেডিসিন'-এ কার্ডিওভ্যাসকুলার অ্যানেস্থেশিয়াতে ফেলো হওয়ার জন্য টেক্সাসের হিউস্টনে চলে আসেন। সেখান থেকেই ফোনে তাঁর ভবিষ্যৎ স্ত্রী, ডাঃ ভগবন্তীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে জীবনসঙ্গী করার জন্য বিমানদা ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে ফিরে যান। সেখানে 'রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস'-এর অ্যানেস্থেটিস্টস ফ্যাকাল্টিতে যোগদান করেন।
১৯৬৯ সালে তিনি আমেরিকান 'বোর্ড অফ অ্যানেস্থেসিওলজি'তে বোর্ড সার্টিফায়েড হন। আবার ফেরেন হিউস্টনে। পরে তিনি 'মেথোডিস্ট হাসপাতাল'-এ এবং তার পরে 'সেন্ট লুক'-এর টেক্সাস হার্ট ইনস্টিটিউটে কার্ডিওভ্যাসকুলার অ্যানেস্থেশিয়া প্র্যাক্টিস করেন। এর পর তিনি তাঁর নিজস্ব অ্যানেস্থেশিয়া দল গঠন করে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস শুরু করেন। অবশেষে ১৯৯৫ সালে 'প্লাজা ডেল ওরো হাসপাতাল'-এ অ্যানেস্থেশিয়ার প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।
হিউস্টনে বসবাসকালীন তাঁর বাগানের কাজে ও মাছ ধরায় বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। তিনি 'হিউস্টন রোজ সোসাইটি'র একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁর এক ভাল বন্ধুর সাথে গ্যালভেস্টনে প্রায়ই মাছ ধরতে যেতে পছন্দ করতেন তিনি।
বিমানদার আত্মার শান্তি কামনা করি।

Dr Biman Behari Das (1 Feb, 1935-5 May, 2022)

Gopaal Seyn (Neil), Art Director, Redbluearts LLC

গোপাল সেনকে আমরা ইন্দ্রনীল সেন নামেও চিনি। হিউস্টনে একাধারে ছোট, বড় বহু মানুষজন তাঁর কাছে চিত্রশিল্প শিক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়াও সারা বিশ্বে তাঁর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক।

সম্পাদকীয়

দুর্গাপূজা হিন্দুধর্মের একটি পুরনো ঐতিহ্য, যদিও এর সঠিক উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না; তবে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে ষোলো শতক থেকে বেশ কিছু ধনী পরিবার দুর্গাপূজা উৎসব সাড়ম্বরে উদযাপন করে তাকে মহোৎসব করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এই পূজা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম এবং বাংলাদেশের রাজ্যগুলিতে বিশেষভাবে জনপ্রিয়।
সম্প্রতি (২০২১ সালে) কলকাতার দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage (ICH) (অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) তালিকায় স্থান পায়। কলকাতার দুর্গাপুজো অনবদ্য, সন্দেহ নেই; কিন্তু বাঙালিরা পৃথিবীর যে অংশেই থাকুক না কেন দুর্গাপুজো উদযাপনে পিছপা হয় না। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পূজাসংখ্যাও বাদ পড়ে না।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ চিন্তা করে নিলে আক্ষেপ করার সুযোগ কম হয় অবশ্যই; কিন্তু সব পদক্ষেপের আগে সুচিন্তা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না অনেক ক্ষেত্রে। সেসব ঘটে যাওয়া ঘটনা সচরাচর আমরা নিজেদের বিবেক ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে সামলে নিই। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে সামলানোর বদলে তার অধোগতি ঘটে, সেক্ষেত্রে অতি অবশ্যই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং বেশিরভাগ সময় সেসব মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের অধঃপতনের নজিরও আমরা দেখতে পাই।
বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি এমন, যেখানে আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দুষ্টের দমনের জন্য মা দুর্গার আবির্ভাবে মায়ের স্বস্তি ও শান্তির আচ্ছাদন অত্যাবশ্যক!

হিউস্টনবাসী সোমা ও সন্দীপ দাশগুপ্তর সন্তান, অনুভব দাশগুপ্ত, বয়স ১৭; এই সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্র শিল্পী।
অনুভব শিল্পী শ্রী ইন্দ্রনীল সেনের কাছে শিক্ষারত। ইন্দ্রনীল সেন চিত্রিত দুর্গার একটি প্রতিকৃতি এই সংখ্যার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।
অনুভব দাশগুপ্ত এবং ইন্দ্রনীল সেনকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সকল লেখক, লেখিকাদেরও।
পাঠচক্রের পক্ষ থেকে রইল পূজা অভিনন্দন।
মালবিকা চ্যাটার্জী

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবেশ দ্বারের কাছে ফুলের সাজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি ও তথ্য ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।

পঞ্চাশোর্ধ্ব বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্বে নজরুল প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব

শেলী শাহাবুদ্দিন

এক

উনিশ'শ একাত্তর সালে যে সকল দেশপ্রেমিক বাঙালি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে না পেরে অবরুদ্ধ বাংলায় সীমাহীন আতঙ্ক, উদ্বেগ, আশা-নিরাশা, আর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়েছেন, প্রতিদিন মৃত্যু বরণ করেছেন, প্রতিদিন পুনর্জীবন লাভ করেছেন, তখন কারা ছিলেন তাঁদের অন্তরের প্রধান তিন মৃতসঞ্জীবনী শক্তি? সেই তিনজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও শেখ মুজিবুর রহমান।

আবার, যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্কটে, সংগ্রামে যাঁরা অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের মধ্যেও রবীন্দ্র-নজরুল-মুজিব ছিলেন প্রধান তিন শক্তি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দুই প্রধান আধ্যাত্মিক শক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, আর নেতৃত্বে ছিলেন মুজিবর রহমান। তিনিই বাংলাদেশের স্থপতি। কাজেই বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ব্যক্তি হিসাবে প্রধান শক্তি ছিলেন এই তিনজন মানুষ। এঁদের পূর্বসূরি আরো অনেকে বাংলাদেশ সৃষ্টির আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে কাজ করেছেন। সমষ্টিগতভাবে বাংলার সকল দেশপ্রেমিক মানুষ এই নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে ওপার বাংলারও অসংখ্য মানুষ রয়েছেন যাঁদের অবদান কোন অংশে কম নয়; অবদান রেখেছেন বহু দেশপ্রেমিক সংগঠনও।

মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল হক লিখেছেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়টাতে আমি সোনামুড়ার মেলাঘর ক্যাম্পে ট্রেনিং-এ ছিলাম। এ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পটি ছিল 'কে' ফোর্সের অধীন। আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছেন গেরিলা কমান্ডার ক্যাপ্টেন হায়দার। একদিকে দেশের জন্য যুদ্ধ করব এ উদ্দীপনা বুকের ভেতর, অন্যদিকে অনভ্যস্ত কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে গজারি শাল সেগুনের বিশাল বনে কয়েকটি টিলার ওপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টাঙানো ত্রিপলের তাঁবুর নিচে সহযোদ্ধারা একসঙ্গে রাত কাটাই। পাহাড়ে জঙ্গলে ঝুপ করে রাত নেমে এলে কোনো আলো জ্বালানো যেত না। বিভীষিকাময় এমন রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত রবীন্দ্র-নজরুলসঙ্গীত আর দেশাত্মবোধক গানগুলো আমাদের প্রত্যেকের চেতনায় তরল আগুন জ্বেলে দিয়ে আত্মবিসর্জন দেওয়ার শক্তি সঞ্চার করত।"(১)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এবং সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কত বিপুল তার প্রমাণ বাংলাদেশের জাতীয়সঙ্গীত তাঁরই রচিত।

অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' এবং নজরুলের 'চল চল চল' গানটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রণসঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছে।

একথা মনে হতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করে নজরুল কীভাবে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হন?

উত্তর এই, যে আমাদের দেশ ছিল ভারতবর্ষ। ভাষাগত অঞ্চল ছিল বাংলা; পশ্চিম বা পূর্ববাংলা নয়। ওসব ছিল ইংরেজ সৃষ্ট মেকি রাজনৈতিক কাঠামো, যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর নানা জায়গায় আগেও বারবার সৃষ্টি করেছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে।

রবীন্দ্রনাথই আমাদের জাতীয় কবি হতেন যদি দেশ ভাগ না হতো। ভাগ হওয়ার পরে দুই দেশের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ হতে পারেননি; তার অন্যতম কারণ, মাঝখানে পাকিস্তানের ২৫ বছর। পঁচিশ বছর পরে এই দ্বিখণ্ডিত বাংলায় যখন নতুন করে জাতীয় কবি নির্বাচনের ভাবনা সৃষ্টি হয়, তখন নজরুলের চাইতে শ্রেয়তর কেউ ছিলেন না তাঁর সেই নির্বাক অবস্থাতেও।

অধ্যাপক আফজার হোসেনের ভাষায়, "No poet in the history of Bangla literature – with the exception of Rabindranath Tagore – can simply match up to the staggering range of Kazi Nazrul Islam's preoccupation and pursuits. A poet and a musician in the first place, Kazi Nazrul Islam (1899-1976) was also a music director, music teacher, short-story writer, novelist, playwriter, essayist, a creative 'theorist' in his own right, film maker, editor, journalist, drummer, even an actor. And Nazrul was a spectacularly vibrant activist. (২)

পৃথিবীতে নজরুলই একমাত্র কবি, যাঁর একটি বা দুইটি নয়, ছয়টি কবিতার বই সরকার (ব্রিটিশ) বাজেয়াপ্ত করেছিল। রাজবন্দী নজরুল জেলখানায় বেআইনি জুলুমের প্রতিবাদে ঊনচল্লিশ দিন ধরে যে কঠোর অনশন পালন করেছিলেন, আর জেলে বসে সেই অনশনের মধ্যেই যেভাবে তাঁর প্রলয়ঙ্করী গানে আর বিদ্রোহী আচরণে ব্রিটিশ সরকারের দমন ব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন, পৃথিবীর আর কোন কবি তা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

ত্রিশ লক্ষ বাঙালির রক্ত আর ছয় লক্ষ বাঙালি নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে যে দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার জাতীয় কবি হওয়ার জন্য নজরুলের চাইতে যোগ্য ব্যক্তি আর কে হতে পারতেন?

তদুপরি তখনকার হতদরিদ্র বাংলাদেশ আর নজরুলের সারা জীবনের হতদরিদ্র অবস্থা ছিল পরস্পরের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা ও বোধের গভীরতা অতুলনীয়। কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষ, কৃষক-শ্রমিক, আর সব ধরনের হতদরিদ্র মানুষদের নজরুল যতটা কাছ থেকে দেখেছেন, নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে সে সুযোগ ছিল না।

এ প্রসঙ্গে কবি আবু আফজাল সালেহ লিখেছেন, "নজরুল বাংলা কাব্যের জগতে স্বকীয়তাসহ পা রাখেন ২০ শতকের দ্বিতীয় দশকে অগ্নিবীণা (১৯২২) কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর আগে ঊনিশ শতকের শেষভাগ আর বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত যাঁরা বাংলা সাহিত্যের জগতে দাপটের সঙ্গে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, তাঁদের বড় অংশই ছিল হয় ব্রিটিশ সরকারের সুবিধাভোগী, নতুবা সুবিধাপ্রত্যাশী। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা অথবা চিন্তা-চেতনার সঙ্গে কোন না কোনভাবে রাষ্ট্র-ক্ষমতার সম্পর্ক ছিল। নজরুলের কাব্য আর চেতনা প্রবলভাবে মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তসুলভ চাতুরি ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত। যেখানে আঘাত করার, সেখানেই তাঁর আঘাত।"(৩)

অনেকে হয়তো মনে করেন যে নজরুল মুসলমান ছিলেন বলেই মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে জাতীয় কবির স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য এই যে – কথাটা সত্য হলেও তা মোটেই সাম্প্রদায়িক কারণে নয়। বরং ঠিক তার উল্টো।

নজরুল তাঁর সৃষ্টিকর্মে, কবিতায় ও গানে, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সৃজনশীলতার যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন, সেই উচ্চতায় নজরুলের সমকক্ষ তো নয়ই, তাঁর কাছাকাছিও পৃথিবীতে কেউ আছেন কিনা আমার সন্দেহ। তার প্রমাণ হিসাবে শুধুমাত্র নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতগুলোর উদাহরণই যথেষ্ট। মুসলমান কবি হয়েও নজরুল যে শ্যামাসঙ্গীত সৃষ্টি করে গেছেন, সেগুলি সর্বতোভাবে অতুলনীয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বাংলদেশের আহত মানুষের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা নজরুলের কবিতায় যে প্রচন্ড গর্জন শুনেছি, তেমনই শক্তিশালী ছিল নজরুলের নিজের জীবনের অসাম্প্রদায়িক স্বভাবের দৃঢ়তা ও লড়াই।

অতি শৈশবে খাদেম, মুয়াজ্জিন আর ইমামতির কাজ করেও নজরুলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। নার্গিসকে (নীতির প্রশ্নে) বিয়ে না করে প্রমীলাকে বিয়ে করেন। প্রমীলা ও তাঁর মাকে নিয়ে পরিবার ও জীবন রচনা করে সমাজের সাথে সেই পরিবারের অসাম্প্রদায়িক অধিকার রক্ষায় একা লড়াই করে যান। নজরুল সারা জীবন লড়াই করেছেন সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে।

সৃজনকালে মুসলমান প্রধান বাংলাদেশের চার স্তম্ভের একটি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। সেই দেশে অসাম্প্রদায়িক কবিদের মধ্যে নজরুল ছাড়া যোগ্যতর আর কে ছিলেন? নজরুল যে মুসলমান ছিলেন, সেটি বাংলাদেশের জন্য একটি বাড়তি রাজনৈতিক সুবিধা ছিল। অন্য কিছু নয়।

এই হ'ল নজরুলের জাতীয় কবি হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা।

নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা এদেশের মাটির সাথে। মাটির মানুষের সাথে। যে মাটি সহস্র বছর ধরে আউল-বাউল, লোককবি, চারণ কবি, আর তারও পরে একসময় মুসলিম সুফী-দরবেশ ইত্যাদি সকল মানুষের সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বাংলার অসাম্প্রদায়িক মানুষ ও সমাজের মনন গড়ে তুলেছে। এমনকি হিন্দু জাতিভেদ প্রথার নিকৃষ্টতম অবস্থাতেও – যদিও শ্রেণীবিভেদের নোংরামি ও লাঞ্ছনা ছিল, তবুও তাতে ধর্মীয় সংঘাতের কোন উপাদান ছিল না। তখন সাম্প্রদায়িকতার কোন ধারণাই মানুষের ছিল না।

সেকালে এক দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করত। আক্রমণকারী ও আক্রান্তের ধর্ম ও ভাষা কখনও ছিল ভিন্ন, কখনও একই।

সেটি কোন বিষয় ছিল না; কারণ ছিল ভূখন্ড বা সম্পদ। অন্যের ভূখন্ড দখলের পরে কোন কোন বিজেতা মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছে মূলত ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য। সেই আচরণ তুলনামূলকভাবে ভাল ছিল। কারণ তারও আগে সাধারণত বিজেতা শক্তি সমস্ত বিজিত জনপদ পুড়িয়ে দিয়ে, অধিকাংশ মানুষ হত্যা করে, বাকিদের দাস হিসাবে ব্যবহার করত। অন্তত এই উপমহাদেশের মানুষগুলি,অর্থাৎ তাদের দেশগুলি ভূখণ্ডের ভেতরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে জানতই না। এই একই আঞ্চলিক আচরণের দৃষ্টান্ত আমি লিবিয়াতেও দেখেছি। সেখানে অন্য দেশ, বিশেষ করে তাদের অতীতের অত্যাচারী দখলদার দেশের প্রতি ঘৃণা দেখেছি। কিন্তু কোন ধর্মের প্রতি ঘৃণা দেখিনি।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি রাজতন্ত্র রক্ষার জন্য জঙ্গি রপ্তানি করে। ওয়াহাবী (ধর্মীয় আন্দোলন বা ইসলামের একটি শাখাগোষ্ঠী) রপ্তানি করে, কারণ তারা গণতন্ত্রকে ভয় পায়। যে কোনো প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে ভয় পায়। অথচ ভারত তাদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বর্তমানে ভারতীয়রাই মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম অভিবাসী কর্মী ও ব্যবসায়ী।

মৌলবাদীরা এই কথাটা সম্ভবত আজও বোঝে না যে এই উপমহাদেশে, বিশেষত বাংলায় সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধর্মের নামে যতই উস্কানি দেওয়া হোক, ভয় দেখানো হোক বা মগজ ধোলাই করা হোক না কেন, এদেশের সমাজে মানুষের অসাম্প্রদায়িক মনন এমন গভীরে শিকড় গেড়েছে যে তাকে উৎপাটন করা মোটেই সহজ নয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে সংগঠিত মৌলবাদী তৃণমূল শক্তির দাপটে অধিকাংশ মহিলা ভয়ে বোরখা পরে গরমে হাঁসফাঁস করেন। তাঁরা অনেকেই জিনিষটা ঘৃণা করেন। আছে কিছু হুজুগপ্রিয় বাঙালি, তাঁরা একে ফ্যাশন মনে করেন। অথচ 'জামাতে ইসলাম' এদেশে কোনদিন চার শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। অর্থাৎ, মৌলবাদীদের যে মূল লক্ষ্য, এদেশের মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতার শয়তানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা – তারা যদি এ বিষয়ে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন নাও হয়, তাহলেও এই কাজে সাফল্য পেতে তাদের বহু শত বছর লেগে যাবে।

আমরা যে মন্দির ভাঙা, হিন্দু জনপদ আক্রমণ, মুখর গ্রন্থে (Face Book) ফাঁদ পেতে ভিন্নধর্মী নির্যাতন, ইত্যাদি দেখি, সেগুলি আজকের ভারতের মতোই রাজনৈতিক ব্যভিচার ও লুণ্ঠন মাত্র। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য ক্ষমতালোভী ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে মৌলবাদী, ভূমিদস্যু, ও ভাড়াটে তস্করদের এই সম্মিলিত উদ্যোগ আমরা বাংলাদেশ ও ভারতে নিয়মিত দেখি। যেমন ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে মানুষ দেখেছে ঠগি, ঠ্যাঙাড়ে ইত্যাদি ডাকাতদের অরাজকতা, তেমনি উপমহাদেশে আজ চলছে মৌলবাদী অরাজকতা।

তাহলে এই অরাজকতার প্রতিরোধের উপায় কি?

বাঙালি স্বভাবের মধ্যে একটা মায়াবী বেড়াল বাস করে। সে গৃহপালিত বেড়ালের মতো রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় প্রভুর যৎসামান্য স্নেহের বিনিময়ে মিউ মিউ করে, আর সেবা করে যায়। দীর্ঘকাল বিনা প্রতিবাদে কারণে অকারণে পড়ে পড়ে মার খায়, তারপর যখন আর সইতে পারে না, তখন নিজেও জানে না, কখন হঠাৎ সে কামড় বসায়। তখন সে বাঘ!

আজীবন আক্রান্ত বাঙালি বেড়াল,
বেঁচে থাকে মার খেয়ে ভয়ের আড়াল,
কোনঠাসা বাঙালি ভীরু ত্রস্ত অনড়,
হঠাৎ সে বাঘ! সে বসায় কামড়!

এই বাঘ আমরা দেখেছি ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে। দেখেছি জাহানারা ইমামের গণজাগরণ মঞ্চে, দেখেছি শাহবাগ প্রজন্মের গর্জনে। ব্রিটিশরা এই বাঘ দেখেছে তারও আগে সূর্য সেন, প্রীতিলতা, সুভাষ বসু, নুরল দীন, কাজী নজরুল, এবং আরো বহু বাঙালির মধ্যে। তাদের ভয়ে ইংরেজ তখন রাজধানী সরিয়ে নেয় কলকাতা থেকে দিল্লিতে। এই বাঘ লুকিয়ে আছে বাংলার বহু কবির কবিতায়।

আপাত দৃষ্টিতে বাঙালি "বোতাম আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।" কিন্তু নিরীহ বাঙালি বেড়ালের অস্থি-মজ্জায় একদিকে যেমন আছে আউল-বাউল, সুফী-দরবেশ, লালন শাহ, হাসন রাজা; অন্যদিকে তেমনি তার স্নায়ুতন্ত্র আর রক্তকণিকায় মিশে আছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, এবং আরো বহু বিদ্রোহীর বাণী ও চেতনা। আর সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের কবিতায়, গানে, জীবন যাপনে, এঁদের সকলের ওপরে আছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?"

বাংলাদেশের জাতীয় কবি সেই মানুষটি, যিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বোত্তম কবি | বর্তমান বাংলাদেশের জন্য নজরুল বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক কারণ নজরুল একদিকে যেমন ছিলেন জন্ম থেকে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষায় লালিত ও অভিজ্ঞ মানুষ, অন্যদিকে নিজ ধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল, ও দুর্বলতাগুলিকে চিনতে পেরেছিলেন গভীরভাবে, এবং সেগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন অসাধারণভাবে | মৌলবাদীরা কোন অসাম্প্রদায়িক মুসলমানকে যেভাবে নিকৃষ্ট মুসলমান বা হিন্দু বলে ঘোষণা করে, নজরুলকে সেভাবে কলঙ্কিত করা অসম্ভব! কারণ নজরুল হিন্দু নারী বিয়ে করেছিলেন, আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করেছিলেন, কিন্তু অন্যদিকে জন্মসূত্রে তিনি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন | প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই যে কোন বিষয়ে গভীরভাবে স্বশিক্ষিত হবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর| অসাম্প্রদায়িক হয়েও সারা পৃথিবীর মুসলমানদের সুখ-দুঃখ তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ ও অনুপ্রাণিত করত |

ইরাকের দুঃখ নিয়ে নজরুল লিখেছেন 'শাতিল আরব' কবিতা| মিশরের নির্যাতিত বিপ্লবী নেতা জগলুল পাশার মৃত্যুতে লেখেন 'চিরঞ্জীব জগলুল'|

"রহিল মিশর চলে গেল তার সুমর্দ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভকায় খসরু-সিংহাসন|
মিশরের চোখে বহিল নতুন সুয়েজখালের বান|
সুদান গিয়াছে, গেল আজ তার বিধাতার মহাদান|"

স্পেন ও ফরাসি অধিকৃত মরোক্কোর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত রিফ উপজাতীয় সর্দার আব্দুল করিমের শৌর্য-বীর্যে মুগ্ধ নজরুল 'রিফ সর্দার' কবিতায় তাঁকে 'নবযুগের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছিলেন| ১৯২২ সালে নজরুল আনোয়ার পাশা ও কামাল পাশার বৈপ্লবিক কাজের সমর্থনে 'আনোয়ার পাশা' ও 'কামাল পাশা' কবিতাদুটি লিখেছিলেন –

"ওই খেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই,
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!"

একই বছরে তিনি নবীর জন্মদিন নিয়ে কবিতা লিখেছেন, আবার দেবী দুর্গাকে নিয়েও কবিতা লিখেছেন|

আফগানিস্তানের প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারক বাদশা অমানুল্লাহকে নিয়ে লিখেছেন 'খোশ আমদেদ, আফগান শের'... ইত্যাদি| (১)

কবি নজরুল একদিকে মুসলমান হিসাবে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের সমস্যায় তীব্রভাবে সাড়া দিয়েছেন, অন্যদিকে গভীরভাবে তাঁর সাম্রদায়িকতা-বিরোধী যুদ্ধও অব্যাহত রেখেছেন | মুসলমান নেতা বা রাজা যাকেই তিনি সমর্থন করেছেন, তা ছিল সেই সব রাজা বা নেতার প্রগতিশীল, কাজের সমর্থনে|

তাই রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, "একুশ শতকেও বিশ শতকের কবি নজরুলের বাণী আরও বেশি প্রাসঙ্গিক | কারণ, একুশ শতকের মানুষ বিশ শতকের মানুষের চেয়ে আরও বেশি সাম্প্রদায়িক এবং হিংসাতুর হয়ে উঠেছে| বিশ শতকের বিশ্বে মানবতাবাদী মনীষীর অভাব ছিল না | কিন্তু একুশ শতকের পৃথিবীতে মানবতাবাদী মহাপুরুষের অভাব অত্যন্ত প্রকট | পৃথিবীর ইতিহাসে মানবজাতি একুশ শতকের মতো কখনো আর এমন সংকটে পড়েনি | তাই বিগত শতকগুলোতে যাঁরা মানুষকে মুক্তির বাণী শুনিয়ে গেছেন, তাঁদের কথাগুলো আজ আবার মানতে হবে, শুনতে হবে এবং এখানেই নজরুল প্রাসঙ্গিক|"(৪)

আজকের বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা রোধে এই হ'ল নজরুলের অন্যতম প্রাসঙ্গিকতা|

দুই

মানুষের মুক্তির জন্য সারা পৃথিবীতে যেসব কবি লিখেছেন, সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে নজরুল কোন কোন বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ | আফজার হোসেন লিখেছেন –

"I have argued that in the interest of decolonizing comparative literature as well as our own mind, Nazrul can profitably be situated in the constellation of a whole host of anticapitalistic and anticolonial poets from Asia, Africa, and Latin America - ones who poetically and powerfully mediated and mobilized the cause of revolutionary politics without degenerating into vulgar didacticism."(৫)

শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুলের যে ভূমিকা, তা শুধু ভারতবর্ষের জন্যই যে প্রাসঙ্গিক তা নয়, সমস্ত পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের জন্য নজরুল প্রাসঙ্গিক|

এ বিষয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রাসঙ্গিক বহু কারণে; যার অন্যতম এই যে, এই কবিতার মতো আর কোন কবিতা পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি।

লেখিকা লিওনারা ডাউনসের ভাষায় – "The only great Bengali poet from the rural proletariat and the first to have publicly raised the demand for the total independence of colonial India in 1922, Kazi Nazrul Islam (1899-1976) enacts insurrectional breaks and breaks with certain ancient traditions of Bengali poetry, while ushering in new ones. Because of his explosively anti-colonial poem titled "Bidrohi" (The Rebel, 1921) – characterized by unprecedented rhetorical, linguistic and even metric energy as well as thematic and structural novelties – it is customary to call Nazrul a 'rebellious poet'."(৬)

ডঃ মইনুল খান লিখেছেন, "নজরুল তাঁর সাহিত্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে (সিনক্রেটিসম) তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, এর ফলে দুই প্রধান সম্প্রদায়কে এক কাতারে আনা এবং সমাজে অধিকতর সহনশীলতা নিশ্চিত করা যাবে। তাই তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় বিভিন্ন চরিত্রকে সংমিশ্রণ করে ব্যবহার করেছেন। কখনো তিনি হিন্দু দেব-দেবীর প্রশংসায় মেতেছেন, কখনো মুসলিম ঐতিহ্যকে তুলে এনেছেন। এই সমন্বয়ের এক অপূর্ব সমাহার তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' (১৯২২) কবিতায় দেখা যায়। এখানে হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্য থেকে শব্দ, চিত্রকল্প, বাগভঙ্গি, রূপক এমনভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে তিনি কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের না হয়ে মানুষের শৃঙ্খল মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন।"(৭)

তাই, নজরুল বাংলাদেশের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত সংঘাতপূর্ণ এই সারা পৃথিবীর জন্যেও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।

আনোয়ারুল হক লিখেছেন, "কবি নজরুল চেয়েছিলেন মানুষের মুক্তি। তাঁকে নিন্দুকরা হুজুগের কবি বলে অবমূল্যায়ন করতে চাইলেও কালের বিচারে তিনিই চিরকালের কবি। তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের বাণী নিপীড়িত মানুষের কাছে মুক্তির সনদ। যতদিন পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার শাসকের শোষণ থাকবে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুঁজিবাদী আগ্রাসন চলবে, ধর্মহীনতার সন্ত্রাস মানুষের মুক্ত চেতনাকে রুদ্ধ করে দিতে চাইবে, ততদিন পর্যন্ত নজরুলের প্রতিবাদী চেতনা আলোর দিশা হয়ে পথ দেখাবে। ১৯৭১-এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে, গণ-আন্দোলনে, জাতীয় সংকটে, বিপর্যয়কালে নজরুল ইসলাম যে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন তার কারণও তো তিনি আমাদের চিরকালের অমোঘ সাহস, সত্য ও প্রত্যয়। বন্ধন মুক্তির সংগ্রাম; আলোকিত মানুষ হওয়ার স্বরলিপি। অনির্বাণ শিখা।"(১)

সমকালীন বিশ্বে নজরুলের এই প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক উইনস্টন ল্যাংলী।

প্রথম ইরাক যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৯১ সালে। ১৯৯৩ সালে "সভ্যতার সংঘর্ষ" (Clash of Civilization) নাম দিয়ে পৃথিবীতে যে নতুন তত্ত্বের প্রচার শুরু হয়েছে, তার ব্যাখ্যা ছিল এই যে সংঘর্ষটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা আদর্শগত শক্তির মধ্যে নয়, এই সংঘর্ষ সংস্কৃতির, বা সভ্যতার। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে এই তত্ত্বের সাথে ইরাক যুদ্ধের সম্পর্ক ছিল। এইভাবে আলোচনা শুরু করে ল্যাংলী লিখেছেন, অতীতে একসময় যুদ্ধ হয়েছে রাজায় রাজায়। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে আরম্ভ হয় জনগণের যুদ্ধ, আর রুশ বিপ্লব নিয়ে আসে আদর্শের সংঘাত। ১৯৮৯ সালের পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের পর থেকে 'সভ্যতার সংঘর্ষ' তত্ত্বের ধারণা শুরু হয়। সভ্যতার সংঘর্ষ তত্ত্বের একটি লেজুড় তত্ত্ব হ'ল বর্তমান পশ্চিমী গণতন্ত্রের পরে পৃথিবীতে সমাজ বিবর্তনের আর কোন ধাপ নেই, এটাই শেষ ধাপ, এবং আমরাই (উদার গণতান্ত্রিক মানুষেরা) পৃথিবীর "শেষ মানুষ।"

এছাড়া মানুষের অধিকারের ওপরে রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে যে ওয়েস্টফালিয়ান ব্যবস্থা (Westphalian System) সৃষ্টি করা হয়েছিল, সভ্যতার সংঘর্ষতত্ত্ব তার সমর্থক। কিন্তু এযুগের মানুষ চায় বিশ্বজনীন ব্যবস্থা (Cosmopolitan System), যেখানে রাষ্ট্রের অধিকারের ওপরে থাকবে ব্যক্তির অধিকার।

ল্যাংলীর মতে নজরুলের চিন্তাধারা ইংরেজ দার্শনিক মাইকেল অকেসটের (Michael Oakeshott) মতোই, যিনি বলেছিলেন, "The voice of poetry seeks to express uniqueness of self, to evoke another and join to compose another and [a] more complex image of

the same kind."

অর্থাৎ 'ব্যক্তির মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে যে স্বাতন্ত্র ও সৃজনশীলতা থাকে কবিতা তাকে প্রকাশ করে, এবং তাদের মিলন ঘটিয়ে সৃজনশীলতার সৃষ্টিকর্মে পরিণত করে।'

"সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝরে!
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশি।
একজন দিলে ব্যথা...
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা... সকলের অপমান!"

(কুলি মজুর – কাজী নজরুল ইসলাম)

নজরুলের কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে ল্যাংলী লিখেছেন যে নজরুলের দৃষ্টিতে তাই সভ্যতার ভবিষ্যৎ সংঘর্ষে নয়, সভ্যতার ভবিষ্যৎ হবে মিলনে। নজরুলের এই "সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ" কারা?

ল্যাংলীর মতে তারা হ'ল পূর্ববর্তী অন্তত আটটি সভ্যতা এবং তাদের মিলন। এবং তিনি বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে, মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনিবার্যভাবে তারা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব পর্যায়ে মিলিত হতে বাধ্য। তিনি দেখিয়েছেন যে নজরুলের কবিতায় স্বাতন্ত্রের মধ্যেই ঐক্যের বক্তব্য ছাড়াও আরো যেসব জোরালো বক্তব্য আছে, তা হ'ল ব্যক্তি ও দলের ক্ষমতায়ন, স্বাতন্ত্রের প্রসার (promotion of diversity), এবং মানুষের জীবন ও সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। (৮)

অর্থাৎ নজরুলের কবিতায় অন্যায় ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে।

সহজ ভাষায় এই কথাটাই বলেছেন লেখক ও শিল্পী শিশির মল্লিক, "বিরুদ্ধবাদীদের পরোয়া না করেই তিনি তাঁর সৃষ্ট কর্মের মাধ্যমে আমাদের জন্য রেখে গেছেন দ্রোহ প্রেম আর ঐক্যের শিল্পীত রচনাসম্ভার। যার আলোয় যে কোন নিপীড়িত বঞ্চিত জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও ব্যক্তি পেতে পারেন জেগে ওঠার শক্তি ও মানবিক দিশা।"(৯)

এই হ'ল নজরুলের বৈশ্বিক কালজয়ী প্রাসঙ্গিকতা।

বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখি একদিকে শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার আন্দোলন, ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। ধনী-দরিদ্র প্রভেদের ক্রমাগত সম্প্রসারণ, কর্পোরেট প্রভুত্বের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা, এবং তার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের বিপরীতমুখী বিবর্তন। তাই নজরুল এবং তাঁর মতো কবিদের বক্তব্য পৃথিবীময় আজ এবং অদূর ভবিষ্যতেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সভ্যতার সংঘর্ষ তত্ত্বের প্রবর্তকরা দেখেছেন মানব সভ্যতার বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা। কবি বলেই নজরুল সেক্ষেত্রে দেখেছেন বিভিন্নতার মধ্যে মিলিত মানবসভ্যতা। আমরা যদি 'সভ্যতার সংঘর্ষ' আর বর্তমান মানুষই 'শেষ মানুষ' তত্ত্বে বিশ্বাস করি, তাহলে মানুষের সভ্যতার কোন অগ্রগতি নেই।

আর আমরা যদি মানবজাতির ভবিষ্যৎ ও মানবতায় বিশ্বাস করি তাহলে কাজী নজরুলকেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। উপসংহারে বিনয় বর্মনের সাথে একাত্ম হয়ে বলা যায়, "তাবৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের মতো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব আর দ্বিতীয়টি নেই, না কোন হিন্দু না মুসলমান। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ যখন ধর্মের নামে মানুষ হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন নজরুলের আদর্শ আমাদের রক্ষা করতে পারে। নজরুল সবাইকে ধর্মপরিচয়ের উর্ধ্বে উঠতে বলেন; তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন:

"মূর্খরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।...
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!"

তরুণ সমাজ যত তাঁর কবিতা পড়বে, ততই তারা কূপমন্ডুকতা থেকে মুক্ত হতে পারবে, নিজের মধ্যে অন্য মানুষের (অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের) ছায়া দেখতে পাবে। বুঝতে পারবে ধর্মের ভেদ আপাত, মানবতার বন্ধনই আসল। মানুষের প্রকৃত পরিচয় – সে মানুষ। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। সকল মানুষ সমান।

"নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি"

(মানুষ)

‘সাম্যবাদী’ কবিতায়ও একই সুর ধ্বনিত।” (১০)

“গাহি সাম্যের গান –
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।”

*****

তথ্যসূত্র:

(১) নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা অনির্বাণ শিখা | আনোয়ারুল হক | যুগান্তর | ২৫ মে, ২০১৮ |

(২) Kazi Nazrul Islam and our struggle for emancipation. Afzar Hussain. May 31, 2020. Janata Weekly. India. https://janataweekly.org/kazi-nazrul-islam-and-our-struggle-for-emancipation/ Downloaded on May 5, 2022.

(৩) নিষিদ্ধ নজরুল ও বর্তমানে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা | আবু আফজাল সালেহ | প্রভাত ফেরি | ২৫ আগস্ট ২০২০ |

(৪) একুশ শতকের বিশ্ব ও নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা | রফিকুল ইসলাম | প্রথম আলো | আগস্ট ২৭, ২০১৫ |

(৫) Kazi Nazrul Islam and our struggle for emancipation. Afzar Hussain. May 31, 2020. Janata Weekly. India. https://janataweekly.org/kazi-nazrul-islam-and-our-struggle-for-emancipation/ Downloaded on May 5, 2022.

(৬) (Flex Examples. Example Poetry. Kazi Nazrul Islam: Poetry, Politics, Praxis. Leonora W. Downs. August 29, 2021. https://www.flexexamples.com/kazi-nazrul-islam-poetry-politics-praxis/ Downloaded on 5/1/22.

(৭) নজরুল ও এর প্রাসঙ্গিকতা | ডাঃ মইনুল খান | ২৩ মে ২০২০ | কালের কণ্ঠ | https://www.kalerkantho.com/online/miscellaneous/2020/05/23/915142 Downloaded on May 16, 2022.

(৮) First Annual Kazi Nazrul Islam Lecture “The Voice Of Poetry And The Ddirection Of Civilizations” by Professor Winston E. Langley. https://asianamerican.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/642/2014/11/WinstonLangleyNAZRULLecture-2007.pdf Downloaded on4/30/22.

(৯) সময় চেতনার কবি নজরুল প্রসঙ্গ: উপেক্ষা ও প্রাসঙ্গিকতা | প্রতিকথা | মে ২৫, ২০২১ | protikotha.com (Downloaded on May 16, 2022.)

(১০) এ-যুগে নজরুল কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা | বিনয় বর্মন | বিডি নিউজ | ২৫ মে, ২০১৭ | https://arts.bdnews24.com/archives/12518 Downloaded on May 16, 2022.

বিদ্রোহী

বল বীর -
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রীর!
বল বীর -
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র-ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর -
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্ব্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃংখল!
আমি মানি নাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম,
ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জ্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী-সূত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর -
চির উন্নত মম শির!

মানুষের সংস্পর্শে মন্ত্রসিদ্ধ কবি

সুমিতা বসু

{প্রবন্ধটির ভাবনা ও লেখার অনুপ্রেরণা একটি চায়ের আড্ডায় রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আলোচনার সময়, যেখানে জনমত বলে, কেন ঘুরে ফিরে বারবার ওই মানুষটাকে টানা? আরো পরিষ্কার করে বললে যেটা দাঁড়ায় সেটা হ'ল, বাঙালির সব পথ, সব ঠাকুর কি একজনই? সঙ্গত কথা।

আয়নায় নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি আজও প্রাসঙ্গিক? সময়টা ২০২২-এর শেষ, আর আলোচনার ঘটনাস্থল আমেরিকার একটি ব্যস্ত শহর। প্রাসঙ্গিকতার প্রসঙ্গ স্বচ্ছ হবে যদি আলোচনাটিকে যুক্তিযুক্ত করতে কয়েকটি উদ্ধৃতি ও উদাহরণ তুলে ধরতে পারি। অতএব এই প্রয়াস।}

রবীন্দ্র-প্রতিভার কালোত্তীর্ণ এবং আদিগন্তব্যাপী বিস্তারের কথা কবির রচনাকালের প্রথম পর্বেই প্রতিশ্রুত ছিল। যেমন ধরা যাক, The World Poet of Bengal পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ১৯০০ সালের এই লেখাটি। জোড়াসাঁকোর 'রবি' নামের ছোট ছেলেটি তখনও বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেননি, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দেখেছিলেন এক বিশাল প্রতিভার উন্মেষ। এই সম্ভাব্য উন্মেষ সময়ের দিক দিয়ে বর্তমানকে ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে ভৌগোলিক গন্ডিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অদূর ভবিষতে কোন সুদূরের চিরন্তনতায় একদিন যে উধাও হয়ে যাবে সময় ও দেশকালের অতীতে – ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তা নিশ্চিত জানতেন। তাঁর লেখা সেপ্টেম্বর ১, ১৯০০ সালের সম্পাদকীয়টি তার প্রমাণ – 'If ever the Bengali language is studied by foreigners, it will be for the sake of Rabindra. He is a world poet, he is like Devdaru, which has its roots down, down the lowlands but which threatens to pierce the sky – such as its loftiness. He will be ranked amongst those seers who have come to know the essence of beauty through pain and anguish.'

রবীন্দ্র জীবনদর্শন ও সাহিত্যভাবনা পারস্পরিক আদান প্রদান এবং দেওয়া-নেওয়ার স্থায়ী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁর লেখাতেও কাল থেকে কালোত্তীর্ণ, জীবন থেকে জীবনাতীত, আমি থেকে আত্মার এই আসা-যাওয়ার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর। নিজস্ব ক্ষুদ্র গন্ডি ছেড়ে আদিগন্তব্যাপী বিশ্বচরাচরে মানুষ যখন বেরিয়ে আসতে পারে তখনই শোনা যায় কবির ভাষায় –

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া"

বাংলার কবি, রবি তো শুধু কবি নন, তিনি বিশ্বলোকের ও চিরকালের আত্মদর্শন-সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি। তাঁর সাধনার একটিই ধন, মানুষের প্রতি ভালবাসা। মানুষের একান্ত স্পর্শই এই জীবনবোধের মূল মন্ত্র এবং সেই স্পর্শে পূজা-প্রকৃতি ও প্রেম পুরোপুরি মিলেমিশে একাকার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেই কবে 'সোনার তরী'-র ভূমিকায় এই অনুভূতিরই স্পর্শ পেয়ে বলেছিলেন, "সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হ'ল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা – বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

চরৈবেতির আকর্ষণে কবির ভ্রমণ তালিকা নেহাত সীমিত নয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বাইরে গেছেন বহুবার – তা প্রাচ্যেই হোক বা পাশ্চাত্যে। বিদেশে থাকাকালীন তাঁর অনেক লেখাই আমাদের সুপরিচিত। তাঁর প্রথম ইউরোপ যাত্রার সময় কবি নেহাতই তরুণ; তারই ছোঁয়াচ লেগেছে তাঁর গানের ছন্দে-ভাষায়-সুরে, যার নমুনা মেলে ভুরি ভুরি:

Scottish folk song যেমন, Ye banks and braes রবীন্দ্রনাথের ছোঁওয়ায় পাই –

"ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে মৃদু কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়..."

(কালমৃগয়া/ রাগ: বিলাতি ভাঙা/ তাল: দাদরা/ রচনা:1882)

তেমনি পাই, বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার Ben Johnson-এর To Celia-র আভাস কবির কলমে –

"কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া..."

(রাগ: বিলাতি ভাঙা/ তাল: একতাল/ রচনাকাল 1885)

বাঙালির চিরপুরাতন চিরনূতন প্রাণের গান –

"পুরানো সেই দিনের কথা"

(রাগ: মিশ্রভূপালী-বিলাতি ভাঙা/ তাল: একতাল/ রচনা :1885)

যার উৎস ও অনুপ্রেরণা Scottish bard Robert Burns-এর "Auld Lang Syne" (Long Long Ago).

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশাল ও বিপুল সংগ্রহশালায় ২২০০-এরও বেশি গানের সংকলনের বিভিন্ন সুর আহৃত হয়েছে যেন দশদিগন্ত থেকে | কবি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন তাঁর সকল সাহিত্যকর্মের মধ্যে গানগুলিই হবে চিরকালের অক্ষয়-অমর | গানের কথায় যেমন আছে অন্ত থেকে অনন্তের স্পর্শ, তেমনি সুরের জগতে প্রাচ্যের মার্গসঙ্গীত, বাংলার লোকসঙ্গীত, সুফিসঙ্গীত, দক্ষিণী রাগরাগিণীর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমীসঙ্গীতও নকশিকাঁথার মতো অত্যন্ত সাবলীলভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে | আর তাঁর এই গানই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ও বিশ্ববিধাতার একমাত্র সেতুবন্ধন | বিশ্বনাগরিক কবির সব ভ্রমণই তাই দেওয়া-নেওয়ার পারস্পরিক আদান প্রদান |

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া |
দেশে দেশে মোর দেশ আছে,আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া |
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই –
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া |"

(উৎসর্গ, ১৪ নং কবিতা)

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২-য় এসেছিলেন আমেরিকার Urbana, Illinois-এ, পুত্র রথীন্দ্রনাথ তখন ছাত্র | রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন রথী ও তার সহপাঠীদের সহায়তায় শান্তিনিকেতনে যদি একটি Agricultural Science বিভাগ স্থাপন করা যায় | সেটা নোবেল পাওয়ার আগের কথা | তখন Mystic Poet of the East হিসেবে কবির ভাষণ দেবার ডাক আসত | কবি সাগ্রহে তা গ্রহণ করতেন, কারণ তখনকার সেই অর্থানুকূল্যে শান্তিনিকেতনের সাহায্য হতো অপরিসীম |

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের আমেরিকাতে ভাষণ দেবার আগেও আরো কয়েকজন বাঙালি তথা ভারতীয় তাঁদের ভাষণে আমেরিকাবাসীদের মনে সাড়া জাগিয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যেমন ১৮৮৩-তে P.C Moozoomdar, ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ | World's Parliament of Religions-এ স্বামীজীর "Sisters and brothers of America... It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world..." এই ভাষণ উচ্চারণের অনুরণনে পরাধীন ভারত সেই মুহূর্তে এক পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছিল পাশ্চাত্যের বুকে | তবুও ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী, আমেরিকাবাসীদের কাছে অজানা ও রহস্যাবৃত হয়েই ছিল |

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকাতে আসা বিবেকানন্দের এই ঐতিহাসিক ভাষণের প্রায় কুড়ি বছর পর | ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদেশের মানুষরা হয়তো আরো একটু বেশি অবগত হয়েছে ততদিনে | University Of Chicago-র journal-এ Stephen Hay রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সম্পর্কে লিখেছেন – রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তদানীন্তন শ্রোতা দর্শকবৃন্দ যেন এক আত্মিক বন্ধন খুঁজে পেয়েছিলেন, '...he consistently advocated closer relationships between Easternmost and Westernmost branches of Indo-European family.'

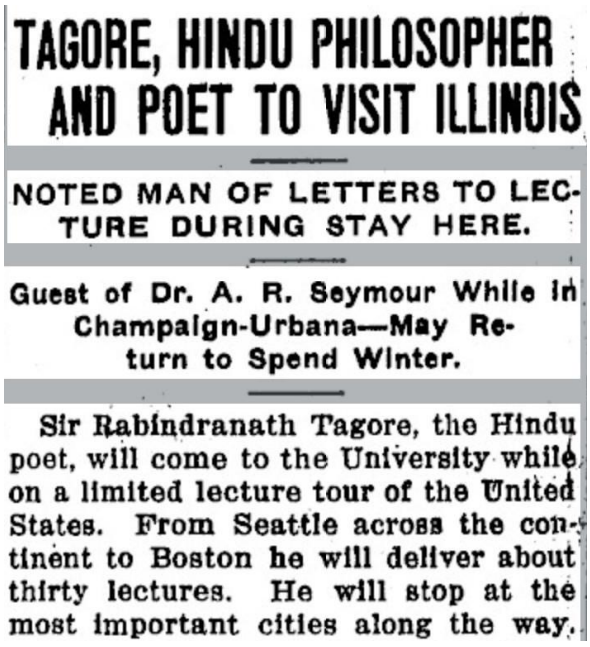

TAGORE, HINDU PHILOSOPHER AND POET TO VISIT ILLINOIS

NOTED MAN OF LETTERS TO LECTURE DURING STAY HERE.

Guest of Dr. A. R. Seymour While in Champaign-Urbana—May Return to Spend Winter.

Sir Rabindranath Tagore, the Hindu poet, will come to the University while on a limited lecture tour of the United States. From Seattle across the continent to Boston he will deliver about thirty lectures. He will stop at the most important cities along the way.

New York Times-এ সেই সময় ২০টিরও বেশী লেখা বেরোয় কবিকে নিয়ে | New York ও Boston-এ তাঁর চিত্র প্রদর্শনীও হয় | সেইসময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন Franklin Roosevelt | কবির সম্মানার্থে New York-এ যে সান্ধ্যভোজের আয়োজন হয়, সেখানে President Roosevelt

উপস্থিত ছিলেন | কবি সেদিন নির্ভীকভাবে তাঁর সংশয় ও উদ্বেগ প্রকাশ করে সভামধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "The age belongs to the West and humanity must be grateful to you for your science. But you have exploited those who are helpless and humiliated, those who are unfortunate with this gift. A great portion of the world suffers from your civilization."

উল্লেখযোগ্য, এর অনেকদিন পরে, তাঁর আশি বছর বয়সে 'সভ্যতার সংকট'-এ লিখেছিলেন এক সুদৃঢ় প্রত্যয়ে, কিন্তু সেই ভাষণেও ছিল অসহায় বেদনা...

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে | কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে! জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে | আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল |"

ফিরে যাই ১৯০০ শতকের গোড়ার দিকে | অতলান্তিকের এপারে কবি আমেরিকাতে আসেন পাঁচবার – ১৯১২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত | কখনো অতলান্তিক, কখনো প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে তাঁর আসা | আমেরিকাতে ১৯১২-১৩, ১৯১৬-১৭, ১৯২০-২১, ১৯২৯ ও ১৯৩০-এ কবি এসেছিলেন; হিসেবে করলে দেখা যাবে, মার্কিন দেশে তাঁর বাস করার সময় মোট ১৭ মাস | ১৯১২ থেকে ১৯৩০, সুদীর্ঘ আঠেরো বছরে আমেরিকার অনেক বদল হয়েছিল, সেই সঙ্গে কবিরও |

১৯১২-র পরেই ১৯১৩তে প্রথম Non-European হিসেবে নোবেল পুরস্কার সম্মান তাঁকে অন্য এক বিগদ্ধ ও Elite শ্রেণীতে বসিয়ে দিল, যা নিশ্চিতভাবেই পরাধীন ভারতের একজন কবি-নাগরিকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা | বলা বাহুল্য, প্রাক নোবেল ও নোবেলত্তোর কবির প্রতি আমেরিকার আপ্যায়নও ছিল ভিন্ন | তাই প্রথমদিকে যখন তাঁর ভাষণ দেবার ডাক পড়ত Mystic Poet হিসেবে, পরে সেটিই হ'ল Western Materialistic কেন্দ্রিক ভাষণ |

সাধারণ শ্রোতা ছাড়াও সারা বিশ্বের অনেক প্রতিভাবান ও মনীষীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার হয়েছে বারবার | সেই রকমই একটি ঘটনা – ইউরোপেই অনেক বছর পরে ১৯২৬ সালে কবির দেখা হয়েছিল আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর বার্লিন নিকটস্থ বাসগৃহে | ১৯৩০শে আরো একবার দেখা হয় এই দুই মনীষীর, কিন্তু তাঁদের ১৯২৬-এর কথোপকথন বহুল প্রচারিত | কবির আগমনে বাড়ির বাইরে কবিকে আপ্যায়ন করতে এসে আইনস্টাইন বলেছিলেন, "I remember a quote from your writing – we are nearest to greatness when we are great in humility."

উত্তরে কবি হেসে বলেছিলেন, "I will memorize your words but unfortunately they are all numbers."

এই সরস আলোচনায় দুই মনীষীরই মন আনন্দে ভরে উঠেছিল সেদিন, কিন্তু যেটি লক্ষ্যণীয় – কবির জীবনদর্শনের মূল মন্ত্রের মধ্যস্বরটি যে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও humility, সেটি বুঝতে আইনস্টাইনের একটুও দেরী হয়নি |

রবীন্দ্রনাথের ১৯১৬-১৭-র এবং তার পরের আমেরিকা ভ্রমণে ২৫টি শহরে বক্তৃতা দেবার ডাক এসেছিল | আয়োজন করেছিল তাঁর প্রকাশক McMillan | সেই সময় ১৯১৬-র অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কবি জাপান ভ্রমণ সেরে Portland, Oregon-এ এসেছিলেন | তিন মাসের ভ্রমণ তালিকা নিয়ে San Franciscoতে এসে The Palace হোটেলে উঠেছিলেন | মনে রাখতে হবে সময়টা – সারা পৃথিবী জুড়ে তখন ডামাডোল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রেশ ইউরোপে, সন্ত্রাসবাদ দিকে দিকে | এ-দল না ও-দল, এই তকমায় প্রতিটি মানুষ |

মানুষকে ভালবেসে যিনি পূর্ণ, মানুষের সংস্পর্শে মন্ত্রসিদ্ধ সেই কবির জীবনে এক সংঘাতিক ঘটনা ঘটেছিল এই সময় | দুটি সন্ত্রাসবাদী দল তখন মাথা চাড়া দিয়েছে, Khalsa Diwan Society (Stockton ভিত্তিক) ও The Hindustan Ghadar Party (San Francisco ভিত্তিক)| ভারতবর্ষের পরাধীনতা মোচন তাদের লক্ষ্য | ১৯১৫-য় রবীন্দ্রনাথ সবেমাত্র ব্রিটিশদের (King George V) কাছ থেকে প্রথম ভারতবাসী হিসেবে তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য Knighthood পেয়েছেন, কবিকে তাই এরা শত্রু ঠাউরে ফেলল | এর পরের ঘটনাটি আরও ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস ষড়যন্ত্র! সক্রিয়ভাবে কবির জীবনহানির চেষ্টা করা

হয়েছিল | গাধর পার্টির নেতা রামচন্দ্র ভরদ্বাজ সম্বন্ধে তখন কাগজে বেরিয়েছিল; 'In his first editorials regarding Tagore, in early October, Ram Chandras was directed against the British, whom he accused of censoring and spying on Indian intellectuals, notably Jagdish Chandra Bose and Tagore.'

কাগজের শিরোনামে বেরোল, 'On his second visit to the USA, in 1916, Rabindranath Tagore was an assassination target...'

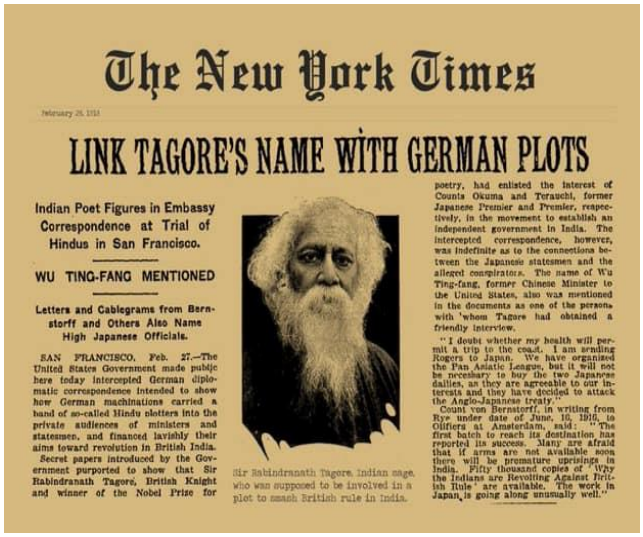

The New York Times

LINK TAGORE'S NAME WITH GERMAN PLOTS

Indian Poet Figures in Embassy Correspondence at Trial of Hindus in San Francisco.

WU TING-FANG MENTIONED

Letters and Cablegrams from Bernstorff and Others Also Name High Japanese Officials.

SAN FRANCISCO, Feb. 27.—The United States Government made public here today intercepted German diplomatic correspondence intended to show how German machinations carried a band of so-called Hindu plotters into the private audiences of ministers and statesmen, and financed lavishly their aims toward revolution in British India.

Secret papers introduced by the Government purported to show that Sir Rabindranath Tagore, British Knight and winner of the Nobel Prize for poetry, had enlisted the interest of Counts Okuma and Terauchi, former Japanese Premier and Premier, respectively, in the movement to establish an independent government in India. The intercepted correspondence, however, was indefinite as to the connections between the Japanese statesmen and the alleged conspirators. The name of Wu Ting-fang, former Chinese Minister to the United States, also was mentioned in the documents as one of the persons with whom Tagore had obtained a friendly interview.

"I doubt whether my health will permit a trip to the coast. I am sending Rogers to Japan. We have organized the Pan Asiatic League, but it will not be necessary to buy the two Japanese dailies, as they are agreeable to our interests and they have decided to attack the Anglo-Japanese treaty."

Count von Bernstorff, in writing from Rye under date of June, 16, 1916, to Olifiers at Amsterdam, said: "The first batch to reach its destination has reported its success. Many are afraid that if arms are not available soon there will be premature uprisings in India. Fifty thousand copies of 'Why the Indians are Revolting Against British Rule' are available. The work in Japan is going along unusually well."

Sir Rabindranath Tagore, Indian sage, who was supposed to be involved in a plot to smash British rule in India.

ডিটেক্টিভ William Mundell আগে থেকে খবর দিয়ে দেওয়ায় কোনোরকমে কবিকে সরিয়ে এনে এবং সবরকম সতর্কতা মেনে এই বিশাল, ভংয়কর জাল থেকে বাঁচানো হয়|

১৯২১-র ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি হিউস্টনের Rice University Auditorium-এ ভাষণ দেন, যেখানে ৭০০০-এরও বেশি উৎসাহী শ্রোতা এসেছিলেন | Rice University-র পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল 'considered genius of age.' সেই সময় আমেরিকাতে তাঁর বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিল, against Western Materialism, Humanity, Awareness of Universal Spiritualism ইত্যাদি | এছাড়াও তিনি Critics about British Machine নিয়েও অনেক কথা বলেছেন, যা অভিধানগত Nationalism থেকে সম্পূর্ণ আলাদা | সেই সময়কার কাগজে বেরিয়েছিল –

'The idea of the Nation is one of the most powerful anesthetics that man has invented. Under the influence of its fumes the whole people can carry out its systematic programme of the most virulent self-seeking without being in the least aware of its moral perversion, – in fact feeling dangerously resentful if it is pointed out." – (Tagore would proclaim in one of his lectures in the U.S. in 1917).'

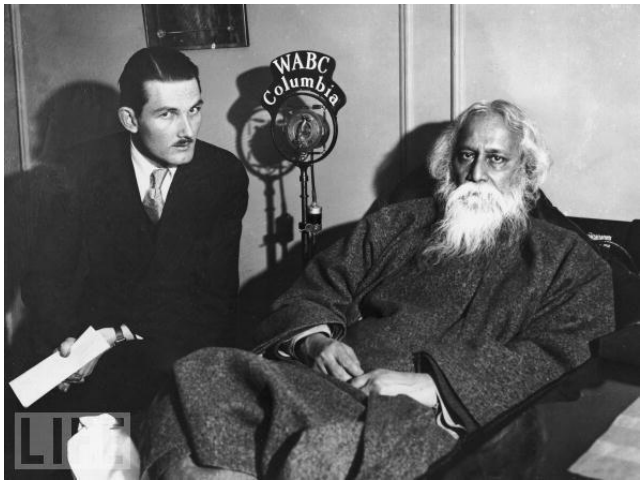

রবীন্দ্রভাবনা ও দর্শন প্রাসঙ্গিকতার প্রসঙ্গে তাই বারবার পঠিত ও উচ্চারিত হয় নৈবেদ্যের ৭২ নম্বর কবিতাটি:

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি..."

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা, গান, নাটক অনুপ্রাণিত করেছে বিশ্বের পাঠককে | আর উপন্যাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত উপন্যাস 'গোরা'-র কথা উল্লেখ করতেই হয় | বিদেশী পাঠক মনে করে, গোরা এক আশ্চর্য বই, এতে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখতে পাই | শিশুকে কোলে নিলে যেমন বোঝা যায় মানুষের কোনো জাত নেই, ভালবাসলে যেমন বোঝা যায় মানুষের কোনো জাত নেই, অথচ এই সত্য কত অজ্ঞাত হয়ে ঢাকা পড়ে থাকে মানুষেরই জীবনে, নইলে সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে বিলাস ও আধুনিকতার চরম শিখরে বসেও মানুষে মানুষে এত হানাহানি কেন? কেন চিত্তে এত ভয়? কেন জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ? কেন গৃহের প্রাচীরকে আমরা খন্ড ক্ষুদ্র করে আকাশচুম্বী করে তুলছি? কেন বসুধা এত ভঙ্গ?

আবার নতুন করে গোরা পড়ে মনে হ'ল, আমরা বাঙালিরা বুঝি আজও তাঁর যথাযথ সম্মান বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারছি না; পারলে, মানুষের ইতিহাসের প্রতিটি পাতা মানুষেরই রক্তে বীভৎস আর কালিমাময় না হয়ে সরস্বতীর বীণার তারেই ঝংকৃত হতো | রবীন্দ্রভাবনার সেই অগ্নিবীণা আমাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দরকার, বিশেষত এই অশান্ত পৃথিবীতে |

কবি শেষজীবনে আস্থা পেয়েছেন প্রাচ্যে ও ভারতবর্ষের সনাতন দর্শনে | উল্লেখযোগ্য, সেই সভ্যতার সংকটেরই উদ্ধৃতি, "আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই | আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি – পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের রিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব | আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে | আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে | মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপমান মনে করি |"

(১ বৈশাখ, ১৩৪৮, শান্তিনিকেতন)

"মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হ'ল আমার জীবনে"

এই 'মানুষের সংস্পর্শ' মন্ত্রই ছিল আজীবন তাঁর ভাবনার মূল সুর |

"ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া..."
(উৎসর্গ, ১৪ নং কবিতা)

অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতা লিখেছেন অসংখ্য | মানুষের সংস্পর্শের সন্ধানী ও পূজারী কবি দেশে দেশে পরমাত্মীয়ের জন্য মুক্ত ও সহনশীল এক বিশ্বের স্বপ্নবীজ বপন করেছেন, যা এখন এক বিশাল সতেজ শাখাপ্রশাখা ছড়ানো মহীরুহ হয়ে আগামী পথিকের জন্য প্রতিনিয়ত অপেক্ষারত –

"When I am no longer on the earth, Oh my tree
Let your new leaves rustle in the spring
Murmur to the wayfarers
The poet loved you..."

এখানেই এবং এজন্যই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা মানবসভ্যতার চিরস্থায়ী ভিত্তি হয়ে অটুট থাকবে |

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় চিত্রিত

(ছবিগুলি অন্তর্জাল থেকে নেওয়া: কৃতজ্ঞতা স্বীকার রইল)

বৃষ্টিদিনের হর্স ওয়াগন

অলোক কুমার চক্রবর্তী

(মুখবন্ধ: আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলিন নিবাসী আমার ভাইঝি শ্রীমতী সোনালি রায় ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের Duomo-র সামনে তোলা একটা ছবি পাঠিয়ে আব্দার করেছিল একটা গল্প বা যাহোক কিছু লিখতে | সেই লেখাটাই এখানে পেশ করছি | উপজীব্য ছবিটাও দিলাম |)

একটানা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টিটা হয়েই চলেছে, বোধহয় ইংল্যাণ্ডের কুখ্যাত বৃষ্টির মর্যাদা রাখতেই| বিষণ্ন মেঘের চাদর পাশের জঙ্গল 'অক্সফোর্ডশায়ার উডল্যান্ডস' আর তার মাঝে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা 'হোয়াইট হর্স হিল' সহ পুরো বার্কশায়ার ডাউনস-এর প্রায় সবটাই ঢেকে রেখেছে | আমি এসেছি অক্সফোর্ডশায়ারের দক্ষিণপূর্ব অংশে ফ্যারিংডন থেকে ছ-সাত কিলোমিটার এগিয়ে ছোট এক গ্রাম আফিংটন-এ | সময় ও কিছুটা একঘেয়েমি কাটাতে একটা শখের কাজের সঙ্গে একটু ঝোঁকের মাথায় ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চল দেখার বাসনায় চলে এসেছি এখানে দুদিন হ'ল| এখন বেলা প্রায় একটা, ফার্নহ্যাম রোড, ব্রড স্ট্রিট আর উলস্টোন রোডের তেমাথার ওপরই একটা ছোট পাব, 'ব্রিয়ারস'-এ একটা ব্যালান্টাইন্স স্কচের পেগ নিয়ে বসেছি| সামনে প্রায় জনবিরল রাস্তায় ছাতা বা বর্ষাতিতে ঢাকা দু'চারজন লোকের আসাযাওয়া আর বৃষ্টি ও মেঘের অবিশ্রান্ত চলন দেখে যাচ্ছি| হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট মেঘের সঙ্গে মিশে যেন সাদাটে ওড়নার মতো কেউ দুলিয়ে বা উড়িয়ে দিচ্ছে|

গ্রাম হলেও আফিংটন-এর একটু পর্যটক-আকর্ষণ আছে | আদিগন্ত নরম সবুজের আস্তরণ তো আছেই, আছে মধ্যযুগীয় কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন 'আফিংটন ক্যাসল' ও রহস্যময় ভগ্নস্তূপ 'ওয়েলারস স্মিদি', অনতিউচ্চ হোয়াইট হর্স হিলে সম্ভবত ব্রোঞ্জযুগের প্রাকৃতিক খেয়ালি সৃষ্টির নিদর্শন 'হোয়াইট হর্স'| পাহাড়ের ওপর প্রায় ৩৬০ ফুট লম্বা এলাকা জুড়ে সুগভীর ট্রেঞ্চ বা নালা এমন আকৃতিতে কাটা হয়েছে আর সেগুলো ভরা রয়েছে সাদা চকের গুঁড়োতে, দেখে মনে হয় যেন একটা ছুটন্ত সাদা ঘোড়ার স্কেচ কেউ করে রেখেছে| আর এইসবের ওপর আছে বাল্য-কৈশোর বেলায় স্বপ্ন দেখানো বই, Thomas Hughes-এর 'টম ব্রাউনস স্কুল ডেজ'-এর আকর সেই স্কুলটি | ১৬১৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাগবি স্কুল হিসেবে| Thomas Hughes-এর বাড়িও এখানেই, ব্রড স্ট্রিটে

একটি ব্রুকের পাশে | সেটিও এখন একটি স্মৃতিসৌধ | গ্রামের মধ্যে দিয়েই এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে সুন্দর স্বচ্ছ জলের ছোট নদী 'স্টুটফিল্ড ব্রুক'| এপাশ ওপাশ থেকে আরও কয়েকটি স্বচ্ছ স্রোত এসে মিশেছে স্টুটফিল্ড ব্রুকের সঙ্গে| পুরো এলাকাটা চক বা সাদা খড়িমাটির ওপর সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢেউ খেলানো প্রান্তর, মাঝে মাঝেই তাকে কেটে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে অজস্র ব্রুক বা ছোট ছোট স্রোতধারা| আমার একটা নেশা হ'ল, বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে যেসব স্থাপত্য ও প্রাকৃতিক চিহ্নের উল্লেখ আছে, সেগুলিকে খুঁজে বার করে মেলানো | এখানে আসার পেছনে ওই 'টম ব্রাউনস স্কুল'ই ছিল প্রধান তাগিদ | এখন স্কুলটিতে মিউজিয়াম করা হয়েছে, শনিবার আর রবিবার শুধু খোলা হয় | সেই হিসেবে আগামীকাল মিউজিয়ামে ঢুকতে পারব | তার আগে অন্যান্য দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখা হয়ে গেছে | ছোট জায়গা হলেও ট্যুরিস্ট স্পট হওয়ার দরুন এখানে 'ফক্স অ্যান্ড হাউন্ডস', 'হোয়াইট হর্স', 'নর্টন হাউস' ইত্যাদি কয়েকটি ৪-৫ তারা হোটেল হয়েছে| কিন্তু আমি একটু কমদামি হোটেল 'দ্য ওল্ড চ্যাপেল'-এ আস্তানা গেড়েছি | এই তেমাথা মোড় থেকে ফার্নহ্যাম রোডের দিকে একটু এগোলেই ডানহাতে পড়বে 'টম ব্রাউনস স্কুল'| তার পিছনেই ঘন গাছপালাভরা বড় এলাকার মধ্যে সেন্ট মেরিজ চার্চ| এই চার্চকে ঘিরেই 'আফিংটন প্যারিশ' বা শাসনাঞ্চল, অর্থাৎ এই চার্চের যাজকের নির্দেশেই এই এলাকার শাসনকর্ম পরিচালিত হয়|

একটা কথা খুব চালু আছে যে, ইংরেজরা তাদের দেশের এই বিষণ্ন, মেঘলা ও বৃষ্টিভরা আবহাওয়ার কারণেই স্বভাবগতভাবে নিজেরাও সাধারণত বিষণ্ন ও গোমড়া হয়, মিশুকে হয় না| এই যে আমি একটি বাইরের লোক দুদিন ধরে

কয়েকবার করে এখানে আসছি, বসছি – তা নিয়ে কারও সামান্যতম কৌতূহলেরও প্রকাশ নেই | আমি অবশ্য নিজের প্রয়োজনেই আমার উদ্দেশ্য ও কাজ নিয়ে কথা বলেছি, এদের কারো কারো সঙ্গে আর সত্যিই কিছু খবরসহ উপকারও পেয়েছি এদের কাছ হতে | যাইহোক, পাবের বড় খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে এইসব সাতপাঁচ ভাবছি | আর একজন মাত্র খদ্দের পিছনে কোণার দিকে বসে আছে | পাবের মালিক অ্যান্ডি ব্রিয়ার নিজের মতো টুকটাক কাজ করে যাচ্ছে | হঠাৎ, মোড়ের ওপরেই রাস্তার একটু বাঁদিক ঘেঁষে, যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হ'ল একটি পুরনো দিনের 'সারে' বা 'বারুশে' জাতীয় হর্স ওয়াগন, ব্রডওয়ে স্ট্রিটের দিকে মুখ করা | বেশ কারুকার্য করা, ঝকঝকে চেহারার | সওয়ারি নেই গাড়িতে, কিন্তু একটা হালকা সবুজরঙা ছাতা মাথায় কোচোয়ান সামনে তার আসনে বসে

আছে | দুটো সাদা তেজি ওয়েলার ঘোড়া গাড়িতে জোতা | আমি বেশ চমকেই গেলাম, কারণ আমি তো রাস্তার দিকেই তাকিয়েছিলাম, গাড়িটাকে তো কোনোদিক থেকেই আসতে দেখলাম না! যদি পলক ফেলার মাঝেও ঘটে থাকে, তবে তার চলনের সামান্য একটা রেশ তো অন্তত থাকবে! ঘোড়াদুটোর মধ্যেও কোনো চাঞ্চল্য নেই! যেন কেউ ওপর থেকে হাতে করে খেলনাগাড়ি বসানোর মতো বসিয়ে দিয়েছে | হয়তো আমার কোনো বিস্ময়সূচক উচ্চারণ শুনে অ্যান্ডি ব্রিয়ার আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাস্তার দিকে নিরাসক্তভাবে চোখ বুলিয়ে আবার ফায়ার প্লেসের কাঠগুলো গোছাতে লাগল | আমি অবাক হয়ে তাকিয়েই আছি, হঠাৎ দেখি অত্যন্ত কেতাদুরস্ত সুবেশী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক বিরাট কালো ছাতা মাথায় গাড়ির বাঁদিকে দাঁড়িয়ে তেমনি সুবেশা এক ভদ্রমহিলাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করছেন | কিন্তু তাঁরা কোনদিক থেকে এলেন বুঝলাম না | ওপাশের স্টোরটিরও তো দরজা বন্ধ! ওখান থেকে তো বার হননি! একটু অবাক লাগল, এঁদের গাড়ি ও পোশাক ঠিক ভিক্টোরীয় যুগের না হলেও বেশ পুরনো কেতাসম্মত | ওঁরা দুজন গাড়িতে ওঠার পর গাড়িটা চলতে শুরু করল ব্রড স্ট্রিট ধরে, যেন জল কেটে বা হাওয়ায় ভেসে মসৃণ গতিতে | আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে অ্যান্ডিকে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম, "মিস্টার ব্রিয়ার, হু ইজ দিস জেন্টলম্যান?"

অ্যান্ডি আরেকবার রাস্তার ওপর দিয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টি বুলিয়ে এনে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, "হুম আর ইউ টকিং অ্যাবাউট?"

অবাক হয়ে বলে উঠলাম, "আরে, ওই যে বয়স্ক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা হর্স ওয়াগনে উঠে যাচ্ছেন!"

অ্যান্ডি ঠোঁটের বাঁদিকের কোণে একটা মুচকি হাসি ঝুলিয়ে বলল, "বাদ দিন | ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না | আপনার ড্রিংক কি শেষ হয়েছে? পরেরটা দেব?"

আমি একটু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম, কিছুই মাথায় ঢুকল না | এই পেগটার তো মাত্র অর্ধেকটাই খেয়েছি, এমন নয় যে ভুলভাল দেখব | আর আমার তেমন হয়ও না কখনও |

পিছনে কোণার দিকে বসে থাকা খদ্দেরটি এবার একটু ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল, "কিছু না, আপনি সৌভাগ্যক্রমে স্যার জেফ্রি প্রিস্টিনের দেখা পেয়েছেন | ওহে অ্যান্ডি, এঁকে এভাবে ধোঁয়াশায় না রেখে বরং খুলে বলো, নইলে উনি না ঘুমোতে পারবেন, না ওঁর খাবার হজম হবে |"

আমি একবার করে রাস্তা, অ্যান্ডি আর ওই কোণার লোকটির দিকে দেখতে লাগলাম |

কী ভেবে কে জানে, অ্যান্ডি ব্রিয়ার এবার তার চেয়ারটাতে সুস্থিরভাবে বসে বলতে শুরু করল –

- "দেখুন মশাই, প্রথমেই বলি, আপনি কী দেখেছেন জানি না | কারণ আমি তেমন কিছুই দেখিনি, যা দেখে আপনি অবাক হয়েছেন | তবু বলে রাখছি, এটা নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো আলোচনার মধ্যে যাবেন না | আর আমি যখন বলব, মাঝখানে কোনো কথা বলবেন না, প্রশ্ন করবেন না | অবশ্য আমিও সবটাই শোনা কথা বলব |"

আমি চুপ করে রইলাম | অ্যান্ডি বলে চলল –

- "এই আফিংটনের অনেক কৃতী সন্তানের মধ্যে একজন ছিলেন

স্যার জেফ্রি অলিভার প্রিস্টিন | পণ্ডিত মানুষ, অক্সফোর্ডের একজন কৃতী ছাত্র | ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভিতে একজন সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন জেফ্রি অলিভার প্রিস্টিন | মেধাবী ছাত্র ছিলেন তো, নেভিতেও খুব তাড়াতাড়ি সব কাজ শিখে ও নিজের দক্ষতায় অফিসার হয়ে গিয়েছিলেন স্যার প্রিস্টিন | রয়াল নেভির দুই গর্বের সম্পদ ছিল যুদ্ধজাহাজ-জুটি 'ইনভিন্সিবল' ও 'ইনফ্লেক্সিবল'| সত্যিই অপরাজেয় ও অনমনীয় | স্যার প্রিস্টিন ছিলেন 'ইনভিন্সিবল'-এ | সেইসময় জার্মান ফোর্স নানা ফ্রন্টে মিত্রশক্তিকে প্রায় নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিল | নৌযুদ্ধে ওদের ভয়ঙ্কর নেতা অ্যাডমিরাল গ্রাফ ম্যাক্সিমিলিয়ান ফন স্পী-র নেতৃত্বে জার্মানবাহিনী প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে চলেছে মিত্রশক্তি ও ব্রিটিশ বাহিনীর | আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশ থেকে জার্মানির জন্য যে রসদ আসত, তাকে আটকানো শুরু করে মিত্রবাহিনী | সেই অবরোধ তুলতে ফন স্পী তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ 'শার্মহর্স্ট' (Scharmhorst) ও 'নীসেনও' (Gneisenau) সহ পুরো নৌবহর নিয়ে পৌঁছে যান সাউথ অ্যাটলান্টিক ওশ্যানে | আর তাকে কাউন্টার করতে ব্রিস্টল থেকে অ্যাডমিরাল স্যার ডাভটন স্টার্ডির নেতৃত্বে রওনা দেয় ইনভিন্সিবল ও ইনফ্লেক্সিবল | জেফ্রি প্রিস্টিনও ছিলেন তাতে |

সাউথ অ্যাটলান্টিক ওশ্যানে পৌঁছে ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জকে ঘিরে ৮ই ডিসেম্বর সারাদিন তুমুল লড়াইয়ের পর প্রথমে বিকেলে শার্মহর্স্ট ও পরে সন্ধ্যেবেলায় নীসেনওকে রয়াল নেভি পরাস্ত করে ডুবিয়ে দিতে সমর্থ হয় | দুর্ধর্ষ যুদ্ধনেতা অ্যাডমিরাল ফন স্পীও মারা যান এই যুদ্ধে | এর আগের করোনাল নৌযুদ্ধে রয়াল নেভির বিশ্রী হারের উপযুক্ত বদলাও নেওয়া হ'ল এতে | শার্মহর্স্ট যখন ডুবে যায়, তখনো নীসেনও প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল | তাই শার্মহর্স্ট-এর কোনো ডুবন্ত সেনাকে ওঁরা বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারেননি | তবে নীসেনও যখন ডুবে যায়, তখন ইনভিন্সিবল ও ইনফ্লেক্সিবল-এর সকলে বোট, জাল, দড়ি ইত্যাদি ফেলে ওই বরফগলা জল থেকে প্রায় ১১১ জন জার্মান নৌসেনাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার করে | কিন্তু তার মধ্যে ২০ জনই শুশ্রূষা চলাকালীন মারা যায় | ৩-৪ জন জেফ্রি প্রিস্টিনের কোলে মাথা রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে | এটা ওঁকে ভীষণ আঘাত দেয় |

এই যুদ্ধে দারুণ কৃতিত্ব ও সাফল্যের জন্য প্রিস্টিন পরবর্তীকালে প্রচুর সম্মান লাভ করেন | কিংস ক্রস, নাইটহুডও পান | কিন্তু উনি আগেই যুদ্ধ ছেড়ে পড়াশোনার জগতে ফিরে যান, অধ্যাপনা শুরু করেন | তবে উনি নাকি ওঁর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা ওই জার্মান যুবক নৌসেনাদের কথা প্রায়ই বলতেন ও আফশোষ করতেন |

এরপর স্যার প্রিস্টিন সবকিছু থেকে অবসর নিয়ে গ্রামে এসে থাকতে শুরু করেন | তাঁর অভ্যাস ছিল প্রায়ই তাঁর হর্স-ওয়াগনে চড়ে স্ত্রীকে নিয়ে হোয়াইট হর্স হিলের রাস্তায়, বার্কশায়ার ডাউনস বা এদিক সেদিক ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো | কিন্তু, এইরকমই এক বৃষ্টির দিনে উনি একবার সস্ত্রীক বেরিয়ে আর ফেরেননি | অনেক খোঁজাখুঁজির পর হোয়াইট হর্স হিলের পিছন দিকের ঢালে তাঁদের গাড়িটা ভাঙাচোরা অবস্থায় পাওয়া যায় | উদ্ধার হয় দুটি তেজি ওয়েলার ঘোড়া ও চালকের মৃতদেহ | সবারই চোখে যেন প্রচণ্ড আতঙ্কের চিহ্ন!
কিন্তু আশ্চর্যের যেটা, স্যার জেফ্রি প্রিস্টিন ও লেডি প্রিস্টিনের কোনোরকম হদিশ বা দেহাবশেষ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি |

এখন মাঝে মাঝে এইরকম বৃষ্টির দিনে সেইদিনটার মতোই তাঁদেরকে কেউ কেউ, বিশেষ করে নতুন কেউ এসে দু'চারদিন থাকলে, এইভাবে বেড়াতে যেতে দেখেন | স্থানীয় মানুষও জীবনে অন্তত একবার এই দৃশ্য দেখার সুযোগ পায় | যেমন আমিও একবার ছোটবেলায় দেখেছি | ওই যে বসে আছে টোবি, ও-ও দেখেছে | আসলে, ওঁরা থেকে গেছেন এই গ্রাম আর তার মানুষজনের সঙ্গে চিরকালের জন্য |"

Uffington White Horse

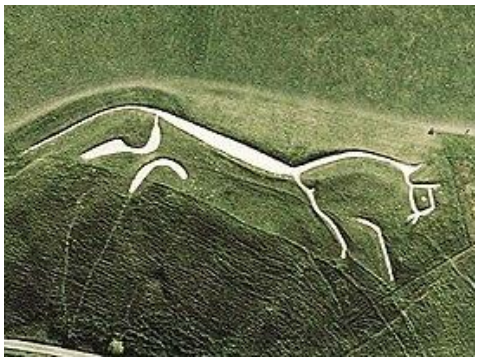

Aerial view of the White Horse

রানীকাহিনী

সংগ্রামী লাহিড়ী

বাড়ি ফিরেই রানী এলিজাবেথ একেবারে প্রিন্স ফিলিপের মুখোমুখি পড়ে গেলেন | তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে কিচেন থেকে বেরিয়ে আসছেন প্রিন্স, পরনে এপ্রন | রানীকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নীল চোখ, "এই তো, এক্কেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ ডার্লিং | লাঞ্চ রেডি |"

রানী মুখে কিছু বললেন না | তাকিয়ে আছেন | মেজাজটা কষটে হয়ে রয়েছে |

হাবভাব দেখে মৃদু হাসলেন প্রিন্স | সত্তর বছরের বেশি বিবাহিত জীবন | রানীর নাড়ীনক্ষত্র তাঁর চেনা |

- "আজকে স্যান্ডউইচ, টুনা মাছ দিয়ে | এক কামড় টেস্ট করে দেখবে নাকি?"

পাতলা, সাদা প্লেটে প্রিন্স এক টুকরো স্যান্ডউইচ দিয়েছেন, মন দিয়ে খাচ্ছেন রানী | মুখের অসন্তোষের ভাঁজগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে |

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রিন্স বলে উঠলেন, "এখন তোমায় দেখলে কে বলবে তুমি ইংল্যান্ডের রানী? কেমন আটপৌরে চাষী মেয়েদের মতো নীলরঙা টুইডের একটা জ্যাকেট পরে বসে বসে খাবার খাচ্ছ!"

- "বাদ দাও তো," রানী উড়িয়ে দেন, "আমি আটপৌরেই থাকতে চাই | রানীগিরি থেকে দুদণ্ড রেহাই পেতেই তো এখানে আসা!"

কথা হচ্ছিল স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসলে | গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এসেছেন দুজনে | প্রতি বছরই আসেন | বাকিংহাম প্যালেস থেকে বেশ দূরে পাহাড়ঘেরা স্কটল্যান্ডের অ্যাবার্ডিনশায়ার সবুজে সবুজ | সেখানেই পঞ্চাশ একর জুড়ে রাজকীয় বালমোরাল এস্টেট | ঠিক মাঝমধ্যিখানে মাথা তুলে আছে সাতমহলা বালমোরাল ক্যাসল | পূর্বপুরুষ রানী ভিক্টোরিয়ার আমলের বাড়ি, রানীর গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান | ছেলেপুলেরা আদর করে ডাকে 'The Big House', 'বড় বাড়ি'|

সকালটা শুরু হয়েছিল ভালই | রানী এলিজাবেথ বেশ খোশ মেজাজেই ছিলেন | মনোরম গ্রীষ্মের দিন, অল্প অল্প হাওয়া বইছে; সূয্যিদেবের ডিউটি শুরু হয়ে গেছে সকাল সকাল | এ সময় দিনের আলো থাকে অনেকক্ষণ | বাগানে টেবিল পেতে বসেছেন রানী এলিজাবেথ, পটভর্তি চা নিয়ে | চায়ের ব্যাপারে রানী খুব খুঁতখুঁতে; খাঁটি আর্ল গ্রে চা ভালবাসেন | কালো চা পাতার মধ্যে সামান্য বেরগামো লেবুর সুগন্ধ | ইতালিতে পাওয়া যায় এই লেবু | অভিজাত মানুষের পছন্দের সুগন্ধি চা এই আর্ল গ্রে | খাওয়াদাওয়ার রুচি-পছন্দে রানী একশভাগ ইংরেজ | চা ছাড়া দিনটা শুরু করার কথা ভাবতেই পারেন না তিনি |

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে রানী চোখ বুজলেন; বোজা অবস্থাতেই হাত বাড়ালেন পাশে রাখা কেকের টিনে | এ কী! টিন ফাঁকা! সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন | এদিক ওদিক তাকাতেই দৌড়ে এল একজন | সেলাম ঠুকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে | জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, ফাঁকা টিন দেখেই সবটা বোঝা হয়ে গেছে তার | দৈনন্দিন এক টুকরো চকোলেট বিস্কিট, কেক তাঁর চাই | এক টুকরোই, তার বেশি নয় | কিন্তু সেটি না পেলে মেজাজ বিগড়োবেই | লোকটি আস্তে আস্তে বলে, "হার হাইনেস, ড্যারেন এতক্ষণে আপনার কেকের টিন নিয়ে লন্ডন থেকে ট্রেনে চেপে পড়েছে |"

রানী উঠে পড়েন | সকালটাই মাটি হয়ে গেল | তবে খাস শেফ ড্যারেনকে ভরসা করা যায় | ঠিক পৌঁছে যাবে চকোলেট বিস্কিট, কেক নিয়ে |

যাকগে, সিঙ্কে কাপ, প্লেট নামিয়ে দিলেন | কী ভেবে জল দিয়ে ধুতে শুরু করেছেন | ফিনফিনে পাতলা, সাদা চিনেমাটির বাসনে একবার চায়ের দাগ লাগলেই হয়ে গেল | উঠবেই না; এত সৌখিন চায়ের বাসন তো আর ডিশওয়াশারে যাবে না! একেবারে মেজেই রাখা যাক বরং | কাপ ধুতে ধুতে রানী টের পাচ্ছেন আড়ালে আবডালে অন্তত তিনজন বাটলার দাঁড়িয়ে আছে | তবে সামনে আসবে না | তারা বিলক্ষণ বোঝে, গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কটল্যান্ডের এই বালমোরাল ক্যাসলে এসে রানী নিজের মুকুটখানা খুলে রাখতে ভালবাসেন | ছেলেমেয়ে, নাতিপুতি, সবাই জানে, স্কটল্যান্ডের এই হাইল্যান্ডে এসে রানী সবচেয়ে বেশি খুশি থাকেন | হুটহাট বেরিয়ে পড়ছেন, কখনো বনভোজন, কোনোদিন আবার মাছ ধরার তোড়জোড় | একদিন ঘোড়ায় চেপে চললেন তো পরের দিনই আবার নাতবৌ,

কেটকে পাশে বসিয়ে নিজের রেঞ্জ রোভার গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসেছেন। আনন্দ আর ধরে না।

চায়ের বাসন ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিচেন টাওয়েলে হাত মুছতে মুছতে রানী ভাবেন, গাড়িটা বার করা যাক। নিজের মনেই একটু মুচকি হাসেন। বাকিংহাম প্যালেসে থাকলে স্টিয়ারিংয়ে বসবার কথা চিন্তাও করা যায় না। শোফার চালিত গাড়ির মতোই সেখানে দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত পূর্বনির্ধারিত, এটিকেট-দুরস্ত। একমাত্র এই বালমোরাল ক্যাসলে এলে রানিগিরি থেকে খানিক রেহাই মেলে।

"কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা" – সেই যে পোয়েট টেগোর একটা গান লিখেছিলেন, শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন রানী। সেবার নভেম্বরে ইন্ডিয়া ভিজিটে গেলেন। পরীর মতো একটি বাচ্চা মেয়ে দুহাত ছড়িয়ে নেচে নেচে পাখির মতো গলায় গানটা গেয়ে শুনিয়েছিল। তার কাছেই বুঝে নিয়েছিলেন গানের কথাগুলির মানে। এক ঝলকের জন্যে রানীর মনে বড্ড দুঃখ হয়েছিল, সঙ্গে এককুচি ঈর্ষা। ইংল্যাণ্ডেশ্বরী কি একবারের জন্যেও কোথাও হারিয়ে যেতে পারেন না? নাঃ, বিস্তর মানা আছে তাঁর হারিয়ে যাওয়ার। ফ্রকপরা এই মেয়েটির মতো ফুরফুরে স্বাধীনতা তাঁর নেই।

ধুৎ, নিকুচি করেছে রানীগিরির। আজ তিনি টুইড পরবেনই, স্কটল্যান্ডের গ্রামের মেয়েরা যেমনটি পরে। সবুজ আর বাদামী, কিংবা নীল, ধূসর আর ছাইরঙা চেক স্কার্ট। সঙ্গে থাকে একরঙা সাধারণ নীলরঙা শার্ট। মাথায় একটা হেডস্কার্ফ নিলে কেমন হয়? এই তো, এই স্কার্ফটা বেশ মানাবে। এবার এর সঙ্গে পায়ে উঁচু একটা বুট। ব্যস, সাজসজ্জা শেষ। বাহ্, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু! আয়নায় নিজেকে ঘুরেফিরে দেখেন রানী।

রেঞ্জ রোভারের অ্যাক্সেলারেটরটায় জোরে চাপ দেন। গাড়ি ছুটছে তাঁর পঞ্চাশ হাজার একর জোড়া বালমোরাল এস্টেটের মধ্যে, সড়কপথে। দুপাশে চোখ জুড়োনো সবুজ আর সবুজ। শিংওয়ালা বিরাট হরিণ ঘাস খায়, লালরঙা কাঠবিড়ালি লাফালাফি করে, গোল্ডেন ঈগল ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় – দুচোখ ভরে দেখেন রানী। এতোল বেতোল কত ভাবনা আসে মনে। ছুটি বললেই কি আর এক্কেবারে নিখাদ ছুটি? তা কখনো হয়? লালরঙা বাক্সগুলো আসতেই থাকে। কর্মচারীরা সামলে নেয় যদিও। নিয়মমাফিক লন্ডন থেকে খোদ প্রধানমন্ত্রী স্ত্রীকে নিয়ে সৌজন্য সাক্ষাতে হাজির হয়ে যান। তখন আবার রানীর ধড়াচুড়ো চাপাতে হয়। দিনের মধ্যে পাঁচবার পোশাক বদলাতে হয়। একটা অফিসিয়াল ডিনার না দিলেই বা কেমন দেখায়? এক টুকরো বাকিংহাম প্যালেস যেন চলে আসে সুদূর স্কটল্যান্ডের এই বালমোরাল এস্টেটে।

ফেরা যাক এবার। গাড়ি ঘুরিয়ে নিলেন রানী। মনে মনে ভাবেন কাল ঘোড়ায় চেপে বেরোতে হবে। ডগিদের সঙ্গে নিয়ে জোরে হাঁটাও যেতে পারে খানিক; হাঁটাহাঁটি একদমই হচ্ছে না।

বাড়ি ফিরতেই হাসিমুখ স্বামীর সামনাসামনি। প্রিন্স ফিলিপ ছিলেন রান্নাঘরের দায়িত্বে। বেরোবার আগে রানী একবার উঁকি মেরে গেছেন। স্বামীকে কাটিং বোর্ড আর ছুরি হাতে দেখে নিশ্চিন্তে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। রান্নাঘর থেকে তিনি দূরে থাকেন। প্রিন্স আবার দুর্দান্ত রাঁধিয়ে। বেকিং, গ্রিলিং, বারবিকিউতে সিদ্ধহস্ত। ছেলেমেয়ে, নাতিপুতি সবাই চেটেপুটে খায় প্রিন্সের হাতের রান্না।

- "বসে বসে কী ভাবছ?" সুভদ্র, সৌম্য মানুষটি এগিয়ে এলেন; কপালে এঁকে দিলেন একটি চুম্বন। আবেশে চোখ বুজলেন রানী। বহুযুগ আগে ভালবেসেছিলেন এই মানুষটিকে, ঘর বেঁধেছিলেন দুজনে। আজ সত্তর বছর পার করেও সে বন্ধন অটুট। রূপকথাও হার মানে, এমনই ভালবাসা দুজনের।

- "আমি চট করে পোশাকটা বদলে নিয়েই টেবিল সাজিয়ে ফেলছি," হাতে উষ্ণ একটু চাপ দিয়ে রানী চলে যান ভেতরে। কোনো কর্মচারী এখন এদিকে আসবে না। তারা জানে, প্রিন্স যদি রান্নাঘরে থাকেন, তাহলে রানী নিজেই টেবিলের দায়িত্ব নেবেন।

অতিথি না থাকলে অবশ্য লাঞ্চ মেন্যু খুবই সহজ সরল। তাতে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করার জায়গা নেই। পাস্তা, আলু, ভাত,

এসব রানী এড়িয়ে চলেন। নিজেদের ক্ষেতের চাষের সবজি, মাছ, ফলবাগান থেকে আনা টাটকা ফল, এসবই পছন্দ তাঁর। আজকের মেন্যুতে স্যান্ডউইচ। প্রিন্স জানেন তাঁর স্ত্রীর পছন্দ। তাই যত্ন করে রুটি থেকে ছিলকা কেটে বাদ দিয়েছেন। চারকোণা রুটির কোণগুলো কেটে গোল করে দিয়েছেন। ভেতরে টুনা মাছ দিয়ে তৈরি পুর।

- "মেয়নেজ দিয়ে টুনা মেখেছি, সঙ্গে একটু পেয়াঁজ আর এককোয়া রসুন!" প্রিন্সের চোখে কৌতুক ঝিকিয়ে উঠছে।

- "গার্লিক?" রানী শিউরে উঠেছেন। গার্লিক তিনি মুখে তুলতে পারেন না। তাঁর রান্নায় রসুন একেবারেই ব্রাত্য। পেঁয়াজও কম হলেই ভাল। বেশি পেঁয়াজের গন্ধ তাঁর সয় না। রাজবাড়ির রাঁধিয়েরা এই নিয়ে কম ঝামেলা করেছে? গার্লিক ছাড়া কীভাবে রোস্ট হবে স্যামন? চিকেন ব্রেস্টের সঙ্গে মাখনের যুগলবন্দীতে গার্লিকের সংগত না হলে চলে? রানী সবাইকে ধমকে দিয়েছেন, "যা বলছি তাই করো। সব রান্নায় রসুন বাদ, পেঁয়াজ খুব হালকা একটুখানি। আমার জিভের অত তার নেই। মানুষ খাওয়ার জন্যে বাঁচে, না বেঁচে থাকার জন্যে খায়?"

পিছন থেকে প্রিন্স দুঃখী দুঃখী মুখ করে তাকিয়ে থেকেছেন। জিভের স্বাদে তিনি রানীর একেবারে উল্টো, ভাল রান্নার সমঝদার। কিন্তু রানীর কারণে রাজবাড়ির রান্না থেকে গার্লিকের পাট একেবারেই উঠে গেছে।

এখন অবশ্য প্রিন্সের দুষ্টুমি রানী ধরে ফেলেছেন। প্লেটে লাঞ্চের স্যান্ডউইচ নিতে নিতে বললেন, "সত্যিই যদি একবার রসুনের গন্ধ পাই তো রাঁধুনির গর্দান নেব।"

- "ডার্লিং, অমন কাজও কোরো না। কাল যে লাঞ্চে তোমার ফেভারিট স্যান্ডউইচ খাওয়াব ভেবে রেখেছি – স্মোকড স্যামন উইথ ক্রিম চিজ। আমার গর্দান গেলে সে স্যান্ডউইচ কে বানাবে প্রিয়ে?"

রানী এবার হেসে ফেলেছেন। হাতের ন্যাপকিনটা দিয়ে প্রিন্সকে ঝাপটা মারলেন, "যত্ত মিথ্যে কথা!"

প্রিন্সও হাসছেন। উজ্জ্বল হয়ে উঠছে 'বড় বাড়ি' দুই বৃদ্ধ লাভবার্ডের কলকাকলিতে।

দুপুর থেকে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামে। এক এক করে ছেলেমেয়েরা, নাতিনাতনিরা বালমোরাল এস্টেটে আসবে তাদের পরিবার নিয়ে। থাকবে কিছুদিন করে। এটাই রাজ-পরিবারের ট্র্যাডিশন। এখন তো নাতির ঘরের পুতিও হয়েছে। খুদেগুলো বাবা-মা'র সঙ্গে চলে আসবে তাদের গ্রেট গ্র্যানি আর গ্র্যান্ডপার সঙ্গে সময় কাটাতে। তাদের পছন্দমতো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শেফ ঘরে ঢুকছে লাল রঙের চামড়া বাঁধানো বিরাট খাতাখানা নিয়ে। তাতে ফ্রেঞ্চ ভাষায় শয়ে শয়ে মেন্যু লেখা আছে। রানী ফ্রেঞ্চ ভাষায় দক্ষ। আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে মেন্যু কার্ডখানা ইংরেজি নয়, ফ্রেঞ্চেই রাখেন। শেফ এবার রানীকে জিজ্ঞেস করে করে আইটেম ঠিক করছে। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার। তাছাড়াও বাইরে খোলা হাওয়ায় পিকনিক, বারবিকিউ। মেন্যু ঠিক হলে তবেই জিনিসপত্র সংগ্রহ করা যাবে। বহু কাঁচামাল এই এস্টেট থেকেই আসবে। ক্ষেতের সবজি, হ্রদের মাছ, খামার থেকে মুরগি, অর্চার্ড থেকে ফল। আর পাঁচটা ঠাকুমা-দিদিমার মতোই রানী সবার পছন্দের হিসেব রাখেন। বড় নাতি উইলিয়াম চকোলেটের ভক্ত, ঠিক তাঁরই মতো। উইলিয়াম এলে মেন্যুতে চকোলেট বিস্কিট, কেক থাকবেই। তবে যে যাই পছন্দ করুক না কেন, রান্নায় গার্লিক থাকবে না, কখনোই না।

বেশ কিছুক্ষণ সময় গেল শেফের সঙ্গে। এবার তাকে বিদায় করলেন রানী। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। এখন তাঁর 'মি টাইম'। টিভির সামনে গুছিয়ে বসবেন। টিভি সিরিজ দেখতে ভালবাসেন। ক্লাসিক ব্রিটিশ সিরিজগুলো তাঁর পছন্দের। বহুদিন ধরে চলছে পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে "The Bill" কিংবা সিট কম "Last of the Summer Wine", তিনটি বুড়ো মানুষকে নিয়ে মজার গল্প। "Midsomer Murders" বা "Doctor Who"ও মন্দ নয়।

হ্যাঁ, টিভির সামনে বসেই তিনি রাতের ডিনার খাবেন। যাকে বলে ক্লাসিক টিভি ডিনার। বেশি কিছু খান না রাতে। হয়তো এক বাটি মরশুমি ফল খেলেন। বাটলার জানতে চায়, "সোনার বাটিতে করে ফল আনি? রুপোর চামচে তুলে তুলে খাবেন?"

হাত তুলে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে রানী জবাব দেন, "একদম না | হলুদ রঙের ঐ যে ফ্রুট বোল আছে, ঐটে আনো | টিভির সামনে আগে ট্রে এনে বসিয়ে দাও | এই যে, এইরকম | হ্যাঁ, এইবার আনো তোমার ফ্রুট বোল |"

পা'দুটি তুলে আয়েস করে কাউচে বসে আটপৌরে রানী টিভির রিমোট ঘোরান | সামনে রাখা থাকে রাতের খাবারের বাটি, হলদে রঙা | আঃ, কী আরাম! কমদিন তো হ'ল না – সাত দশকের রানীগিরিতে কম করে অন্তত দেড়শো ফর্মাল ডিনার হোস্ট করেছেন | সেকথা মনে পড়তে নিজের মনেই একটু হাসলেন রানী | ফর্মাল ডিনারের নিখুঁত এটিকেট তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে শিখতে হয়েছে | সাজসজ্জা, পোশাক আশাক, আলাপচারিতা, কাঁটা চামচের কায়দা, কোনোরকম শব্দ না করে খাওয়া – এসব কি সহজ ব্যাপার? দিনের পর দিন অভ্যাস করলে তবেই না এগুলো আয়ত্তে আসে | রানীই ভোজসভার মধ্যমণি | তিনি খাওয়া শুরু করলে তবেই টেবিলে বসা অতিথিরা খাবেন | তিনি কাঁটা চামচ নামিয়ে রাখলে অতিথিরাও খাওয়া বন্ধ করবেন | সুসজ্জিতা রানী বসবেন প্রিন্সের পাশে, তাঁর ভালবাসার মানুষটির পাশের চেয়ারে | ওই একটিই ভাল লাগা |

অনেক হয়েছে, ঢের হয়েছে, রানী ভাবেন | একটানা সাত দশক ধরে তো সামলালেন রাজকীয় কর্তব্যকর্ম, একই রকম দক্ষতায় | এমন মধুর গ্রীষ্মের রাতে গোল্লায় যাক ফর্মাল ডিনার, নিপাত যাক ডিনার টেবিলের সূক্ষ্ম এটিকেট | বরং বেঁচে থাক টিভি ডিনার চিরজীবী হয়ে, এই বালমোরাল ক্যাসলে |

{সদ্যপ্রয়াতা রানী এলিজাবেথ (II)কে নিয়ে কাল্পনিক লেখা, তথ্য আশ্রয় করে |}

তথ্যঋণ: "Eating Royally" by Chef Darren McGrady.

উপমানব নিয়্যান্ডারথ্যাল

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উৎসর্গ:

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় এই পৃথিবীতে | একজন হলেন Charles Darwin আর অন্যজন মানব চেতনার নির্দেশক Abraham Lincoln. দুটি সরল মূলতত্ত্ব 'Struggle for Existence' আর 'Survival of the Fittest'-এর ভিত্তিতে Darwin প্রমাণ করেছেন প্রাণী-জগতের বিবর্তনবাদ | যদিও কিছু কিছু দৈব দুর্ঘটনা – যেমন ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে মেক্সিকোর Yucatan উপদ্বীপে উল্কাপাতে ডাইনোসরের বিলুপ্তি, আর ১০ হাজার বছর আগে তুষার যুগে (Ice Age) বহু প্রাণী সম্প্রদায়ের অন্তর্ধান – তাঁর নৃতত্ত্ববাদের বাইরে | কিন্তু মানব বিবর্তনের উচ্চতম সোপানে উত্তোলিত হয়েও নব যুগের মানুষ নিজেদের ধ্বংসের এক চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে | সেটা হ'ল হিংস্রতা | উপমানব নিয়্যান্ডারথ্যালের আকস্মিক অন্তর্ধানের সঠিক কারণ জানা নেই, তবে তাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালাদি বিশ্লেষণ করে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের বিলুপ্তির কারণ কোন নরখাদক হিংস্রতা | DNA পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে আমাদেরই পূর্বপুরুষ – Homo Sapiens-এর দন্তচিহ্ন | মানব হিংস্রতা দমনের উপদেশ দিয়ে গেছেন এক মহাপুরুষ – Abraham Lincoln, "Malice toward none... Charity for all." এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত না হলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য |

এই গল্পটি আমি সেই দুই মহামানবের চরণকমলে উৎসর্গ করলাম |

****

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানথ্রোপলজির ক্লাস | বিশ্ববিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর জনাথন স্টাইনহার্ট জীবাশ্ম বিজ্ঞান ও জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন | ক্লাসে তৃতীয় সারিতে বসে শীতাংশু সরকার সামনের বেঞ্চে বসা সীমন্তিনী সেনকে মোবাইলে টেক্সট ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে –

- 'সুমি জানিস, সুব্রত কলকাতা থেকে গাঙ্গুরামের কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে এসেছে, অথচ কাউকে দিচ্ছে না |'

সীমন্তিনীর উত্তর – 'কিন্তু আমাকে দেবে |'

- 'জানি, সেইজন্যই তো আজ সুব্রতর ঘরে হামলা করব। তুই খিচুড়ি বানাবি, আমি ভাজব পাবদা মাছ; তার সাথে তোর দৌলতে সুব্রতর কড়াপাকের সন্দেশ।'

- 'সরি, আজ পারব না, আমার ডেট্ আছে।'

- 'ডাঁট মারিস না; তোর ডেট্ বড়জোর তোকে বিগ ম্যাক খাওয়াবে। তার বদলে ভেবে দেখ খিচুড়ি, পাবদা মাছভাজা আর কড়াপাকের সন্দেশ!'

প্রফেসর স্টাইনহার্টের চোখে পড়েছে – 'মিস্টার সাইমন, শাট অফ দ্যাট মোবাইল।'

শীতাংশু যেন শুনতেই পায়নি; সীমন্তিনীকে আবার টেক্সট পাঠাচ্ছে, 'বুড়ো নাম ঠিকঠাক উচ্চারণ না করলে উত্তর দেব না কিছুতেই।'

প্রফেসর এবার ডায়াস থেকে নেমে শীতাংশুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

- 'মিস্টার সাইমন...'

তাঁর কথা কেটে শীতাংশু বলে উঠেছে, 'সরি স্যার, কিন্তু আমার নাম শীতাংশু, সাইমন নয়। ফর ইওর ইনফরমেশন, শীতাংশু শিবের এক নাম, আর সাইমন যীশু খ্রীষ্টের এক শিষ্যের নাম – দুটো কি এক হ'ল? আপনাকে যদি কেউ জনাথন না ডেকে জনার্দন বলে ডাকে আপনার কি ভাল লাগবে? যদিও জনাথন কিং ডেভিডের বন্ধু, আর জনার্দন হিন্দু ধর্মের ভগবান!'

ক্লাসে সকলে বেশ মজা পেয়েছে, খুকখুক করে হাসছে। জ্ঞানী, সৌম্য, অমায়িক প্রফেসর স্টাইনহার্ট নিজের দোষ মেনে নিয়েছেন। ক্ষমাও চেয়েছেন শীতাংশুর কাছে তাঁর এই ভুলের জন্য। সেই সঙ্গে বলেছেন যে ক্লাসে বসে টেক্সট ম্যাসেজ করা নিয়ম বিরুদ্ধ, আর শিক্ষককে অবজ্ঞা করা অপমানজনক। মাথা হেঁট করে আছে শীতাংশু, নিজের উদ্ধত ব্যবহারের জন্য সে খুবই লজ্জিত।

প্রফেসর স্টাইনহার্ট এই মেধাবী ক্ষ্যাপাটে ছাত্রটিকে খুবই স্নেহের চোখে দেখেন। হেসে বলেছেন, শী...তাংশু তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি মানব বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে যা জানো সেইসব তথ্য এদের সঙ্গে আলোচনা করো। শীতাংশু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে নোবেল লরিয়েট স্টাইনহার্টের মুখের দিকে। ভাবছে তার জ্ঞানই বা কতটুকু আর বলবার সামর্থই বা কোথায় যে এই বিশ্ববিখ্যাত লোকটির সামনে ভাষ্য দেবে! প্রফেসর স্টাইনহার্ট শীতাংশুকে ক্লাসের ডায়াসে নিয়ে গেছেন, অভয় দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

ধীর গম্ভীর গলায় শীতাংশু ভাষ্য শুরু করেছে। বলছে মানব বিবর্তনের আদিম ইতিহাস। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ট্যানজেনিয়ার Olduvai Gorge-এ জীবাশ্ম বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার! ভূস্তরে প্রস্তরীভূত মানুষের পায়ের ছাপ, যে মানব প্রথম মেরুদন্ড সোজা রেখে হাঁটা শুরু করে এবং শিকারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে। সেটা দু-মিলিয়ন বছর আগেকার কথা। শীতাংশু বলছে ইথিওপিয়ার প্রস্তরীভূত কঙ্কালের কথা – 'লুসী', যাকে আমরা বিবর্তনের 'মা' বলে জানি। কিন্তু মানব জাতির বিবর্তনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে সাতাশ হাজার বছর আগে। একই জঠর থেকে জমজ কিন্তু ভিন্ন মানব শ্রেণী বিচ্ছুরিত হয়েছিল – এক হ'ল মানব শ্রেণী, যাকে আমরা পূর্বপুরুষ বলে জানি – মানে Homo Spines; আর অন্যটি হ'ল উপমানব, যার অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পেয়েছি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর Neander Valley-তে (নিয়্যান্ডারথ্যাল)। এক ভাই, Homo Spines বসবাস করছে আফ্রিকার উষ্মদেশে। আর এক ভাই, নিয়্যান্ডারথ্যাল চলে গেছে শৈত্য উপত্যকায়। বহু যুগ ওই দুই জমজ মানবের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। দেখা হওয়া মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই উপমানব নিয়্যান্ডারথ্যাল বিলুপ্ত হয়েছে, মাত্র তিরিশ হাজার বছর আগে। সাত মিলিয়ন বছরের মানব বিবর্তনের মাপ-কাঠিতে এই বিলুপ্তি তো এই সেদিনের কথা! কিন্তু এই বিনষ্ট হবার কারণ কী? ভূতত্ত্বের দুর্দৈব ঘটনা, নাকি মানব জাতির স্বাভাবিক হিংস্রতা?

ক্লাস শেষ হবার ঘন্টা বেজেছে। ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল শীতাংশুর গূঢ় ভাষ্য। সীমন্তিনী অপলকে চেয়ে আছে এই সরল, বেখাপ্পা, অবিন্যস্ত জ্ঞানগর্ভ ছেলেটির দিকে। ওকে তো এমন করে কখনও সে চেনেনি! সব সময়ই মনে হয়েছে সে বাল্যসুলভ। বহুবার সে তার বন্ধুদের ওপর নিজের সৌন্দর্যের জাল বিছিয়ে শীতাংশুকে ঈর্ষান্বিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার উদাসীনতা বার বার সীমন্তিনীকে নিরাশ করেছে। প্রফেসর স্টাইনহার্ট শীতাংশুর পাশে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে শুরু করেছেন, তাঁর সাথে ক্লাসের সকলেও দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিচ্ছে। শুধু সীমন্তিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছে। নিজেকে তার খুব গর্বিত মনে হচ্ছে, শ্রদ্ধা হচ্ছে শীতাংশুর প্রতি। সে নিজের এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার কারণ অন্বেষণ করছে। অমনোনীত একটা উত্তর পেয়েছে

অবশ্য – তারা দুজনেই ভারতীয় বলে বোধহয়!

প্রফেসর স্টাইনহার্ট শীতাংশুকে নিমন্ত্রণ করেছেন ফ্যাকাল্টি ক্লাবে তাঁর সাথে লাঞ্চ করতে। শীতাংশু বলছে তার কোট বা টাই কিছুই নেই, সেসব এত তাড়াতাড়ি জোগাড় করার সময় বা সামর্থও তার নেই। প্রফেসর মৃদু হেসে বলেছেন যে নোবেল লরিয়টদের ভাল মাইনে না দিলেও ইউনিভার্সিটি তাদের ব্যক্তিগত লাঞ্চ-ঘর দেয়, অতএব শীতাংশুর কোট-টাইয়ের কোনও প্রয়োজন নেই।

শীতাংশু মেধাবী ছাত্র। প্রত্যেকটা গ্রাজুয়েট কোর্সে সে A পেয়েছে। এখন তার থিসিস অ্যাডভাইসার খুঁজে পিএইচডির গবেষণা শুরু করার পালা। প্রফেসর স্টাইনহার্ট তাকে অনুরোধ করেছেন তাঁর তত্ত্বাবধানে নিয়্যান্ডারথ্যাল উপমানবের বিলুপ্তির কারণের ওপর কাজ শুরু করতে। এই কাজের জন্য তাকে যেতে হবে ইউরেশিয়ার বেশ কিছু জায়গায়, যেখানে নিয়্যান্ডারথ্যাল প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন আছে। প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম আর গুহার আদিম চিত্রাঙ্কন থেকে তাকে খুঁজতে হবে ওই উপমানবের বিলুপ্তির কারণ।

শীতাংশুর দুনিয়ায় তার এক দূর সম্পর্কের পিসি ছাড়া আর কেউ নেই। সুতরাং তার পক্ষে ভবঘুরে হয়ে এই মহান প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারিবারিক কোন বাধা নেই। সে দেশ ভ্রমণ ভালবাসে, আর তার চাহিদাও খুবই সামান্য। শীতাংশু প্রফেসর স্টাইনহার্টকে জানিয়ে দিয়েছে যে সে এই কাজ করতে রাজি। বলেছে জীবাশ্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে সে কিছু কিছু জানে, কাজের মাধ্যমে বাকিটা শিখে নেবার চেষ্টা করবে। তবে আদিম প্রস্তরশিল্প বা প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলা বিষয়ে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু সে একজনকে জানে, যে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে, এবং সে একজন ভাল চিত্রকরও।

কেম্ব্রিজে মাছের বাজার থেকে বাংলাদেশী পাবদা কিনে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। লাল রঙের মাউন্টেন বাইকটা দেখেই শীতাংশু বুঝেছে যে সীমন্তিনী ভেতরে আছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খিচুড়ি টগবগ করে ফুটছে। উপরে এসে দেখে সীমন্তিনী তার ঘরের জানলার কাছে বসে চার্লস নদীর দিকে চেয়ে আছে। ডুবুডুবু সূর্যের লাল আলো তার মুখে এসে পড়েছে। চোখদুটো চিকচিক করছে। শীতাংশু ভাবছে চোখের জল নয়, নিশ্চয়ই নতুন ধরনের আইল্যাশ মেকআপ। একটু হতাশ হয়ে শীতাংশু বলেছে, 'কীরে সিমি, তুই এখনও খিচুড়ি চাপাসনি? পেটে যে ইঁদুর ডনবৈঠক মারছে! জানি তুই ভাল আঁকিস, তবে কেম্ব্রিজের এই এক ব্রিজ আর চার্লস নদীতে পালতোলা নৌকো – কত আর দেখবি? শোন, আমি ভবঘুরে হতে চলেছি। বরং আমার একটা পোট্রেট আঁক; মরার খবর পেলে পিসিকে পাঠিয়ে দিস। তলায় ক্যাপশন লিখিস – 'Died in search of the other human.'

কোনও উত্তর নেই। সীমন্তিনীর বিনুনিতে টান দিয়ে ওর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে শীতাংশু অবাক হয়ে দেখে সে কাঁদছে, বলে, 'একী রে, কাঁদছিস কেন? বাড়ির সব খবর ভাল তো? ও বুঝেছি, তোর ডেট্ ডজ্ দিয়েছে। তুই যে তাকে এত ভালবাসিস সে কী করে জানবে বল? নো পরোয়া, আজ আমার সাথে ডেট্ কর নাহয়। হার্ভার্ড স্কোয়ারে তোর হাত ধরে হেঁটে তোকে আইসক্রিম খাওয়াব।'

মাথা নিচু করে সীমন্তিনী পাল্টা প্রশ্ন করেছে, 'তুমি নাকি ফিল্ড ওয়ার্ক করতে সেন্ট্রাল এশিয়ায় যাচ্ছ? আমাকে এই খবরটা দেবার সৎ-সাহস হয়নি তোমার? অপমানের বিষয়, খবরটা আমাকে অন্যের কাছ থেকে জানতে হ'ল। ভাল বন্ধুত্বের এই প্রতিদান?'

হা হা করে হেসে ঘর কাঁপিয়ে তুলেছে শীতাংশু। সীমন্তিনীর থুতনি ধরে বলেছে, 'তার জন্য তোর এত অভিমান? কেম্ব্রিজে খবর আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি মানে না, আলোর স্পীডের চেয়েও তাড়াতাড়ি ছড়ায়। দুপুর দুটোয় বুড়োর সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে সোজা ল্যাবে গেছি। ল্যাবের কাজ শেষ করে মাছ কিনে এই সবে বাড়ি ফিরছি। কারো সঙ্গে একটা কথাও হয়নি; তাহলে তুই কী করে জানলি?'

- 'স্টাইনহার্টের ছেলে, ডেভিড আমাকে খবরটা জানিয়েছে। তার বাবা নাকি আনন্দে আত্মহারা। আজ আমার ডেভিডের সঙ্গেই ডেট্ ছিল। খবরটা শুনে এত মাথা গরম হয়ে গেল যে এখানে এসেছি তোমার শ্রাদ্ধ করতে।'

সীমন্তিনীকে কাছে টেনে শীতাংশু তার কপালে একটা হালকা চুমু দিয়েছে। সে বুঝতে পারছে না সীমন্তিনীর চোখের জল তার কেন এত ভাল লাগছে। তাড়া লাগিয়ে শীতাংশু বলেছে, 'নে সিমি, আর সুচিত্রা সেনের মতো অভিনয় করতে হবে না। তাড়াতাড়ি খিচুড়ি চাপা; আমি মাছে নুন-হলুদ লাগাচ্ছি। ভীষণ

ক্ষিধে পেয়েছে রে; অনার সিস্টেম না থাকলে এক্ষুণি সুব্রতর কড়াপাকের সন্দেশগুলো শেষ করে দিতাম।'

প্রফেসর স্টাইনহার্ট ওদের দুজনকেই ফেলোশিপ দিয়েছেন – সীমন্তিনীকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রশিল্পে দক্ষতার জন্য, আর শীতাংশুকে উপমানব নিয়্যান্ডারথ্যালের এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। সেই কাজেই ওরা গেছে স্পেনে El Sidrón Cave-এর ভূস্তরে নিয়্যান্ডারথ্যালের অস্তিত্ব খুঁজতে।

আপাদমস্তক স্টেরাইল জাম্পস্যুট পরে দুজনে গুহার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নেমে চলেছে। হেলমেটে লাগানো জোরদার টর্চবাতি ছাড়া অযুত কালের গাঢ় অন্ধকার তাদের ঘিরে রয়েছে। বেশ অনেকটা নেমে যাবার পর পাওয়া গেল গুহার তলদেশে খানিকটা সমতল জমি। ব্যাকপ্যাক থেকে গ্যাসবাতিটা বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে শীতাংশু গুহার চারদিক পরীক্ষা করতে শুরু করল। এমন সময় শুনতে পেল গুহার অন্য কোণ থেকে সীমন্তিনীর কান্নার শব্দ। 'কী হয়েছে' বলে ছুটে গিয়ে দেখে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। প্রস্তরীভূত তিনটি কঙ্কাল – মা, আট-দশ বছরের একটি ছেলে আর অর্ধ-প্রসবিত একটি শিশু। এই দৃশ্য দেখে দুজনে জড়িয়ে ধরে বিহ্বল হয়ে থেকেছে খানিকক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে সীমন্তিনী ছবি আঁকার সরঞ্জাম বের করে এই গুহার অস্তিত্ব এবং সবিশেষ বর্ণনা তার অঙ্কনে তুলে ধরেছে। গুহার বিবরণী, সীমন্তিনীর পটু হাতে আঁকা ছবি আর হাড়গোড়ের স্যাম্পল বিমান ডাকে প্রফেসর স্টাইনহার্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে পরবর্তী গবেষণার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা।

মাস খানেকের মধ্যেই উত্তর এসেছে। DNA বিশ্লেষণ করে প্রমাণ হয়েছে কঙ্কালগুলি নিয়্যান্ডারথ্যাল উপমানবদেরই, বর্তমান মানুষদের নয়। সারাটা মাস ওরা নিকটবর্তী পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে অনেক প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ডায়েরিতে নোট করে নিয়েছে। প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা তাদের এইসব লোককথা নিয়ে যুক্তিতর্ক হয় – শীতাংশুর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আর সীমন্তিনীর শিল্পী সুলভ চিন্তাধারা।

আজ এক জটাবল্কধারী বৃদ্ধের কাছে গল্প শুনে সীমন্তিনীর মন খুব অস্থির। বৃদ্ধের কথামতো এখান থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে এক পাহাড়ের ফাটলে গিরিগর্ভ পর্যন্ত একটা গুহা আছে। তার দেওয়ালে আছে বহু পুরনো সব চিত্রলিপি। অদ্ভুত সব জন্তু-জানোয়ার, পুরনো কালের মানব-মানবী, বর্তমানের সঙ্গে যাদের বিশেষ মিল নেই। আদিম মানুষেরা অঙ্কনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস। সীমন্তিনী ভাবছে এ যেন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের 'ফেসবুক'। আজ তার চোখে এতটুকুও ঘুম নেই। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে। আকাশে একফালি চাঁদ, চারিদিকে উঁচুনিচু পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে বৃদ্ধের কথাগুলো। তার বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তম হচ্ছে যে ওই জায়গাটিই সেই পরিবেশ, যেখানে এক নব মানবজাতি বসবাস করত, আর প্রণয়াসক্ত হয়ে প্রজনন করত।

তারা দুজনে চলেছে সেই বৃহৎ গুহার খোঁজে। সীমন্তিনীর দৃঢ় সংকল্প অবহেলা করেনি শীতাংশু। তিনদিন জঙ্গলে, পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে শেষে তারা এক বিরাট গুহার মুখে এসে থেমেছে। সীমন্তিনী সারারাত স্বপ্ন দেখেছে সেই আদিম

মানব মানবীরা গুহার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। বাচ্চারা নতুন ধরনের পোষ্য জন্তুদের সঙ্গে খেলা করছে। কাঠের আগুন জ্বলছে গুহার কোটরে কোটরে।

সূর্যোদয়ের পর সারা গুহা আলোয় ঝলমল করছে। শীতাংশু অবাক হয়ে দেখছে গুহার ছাদে স্কাইলাইটের মতো ফাটল। অভ্র পাথর দিয়ে ছাদ তৈরী, সূর্যের আলো তাতে প্রতিফলিত হয়ে গুহাটিকে ঝলমলে করে রেখেছে। গুহার দেওয়ালে যেদিকেই চোখ পড়ছে সেদিকেই প্রস্তর যুগের চিত্রাঙ্কন। সীমন্তিনী চিত্রগুলির অনুলিপি করতে শুরু করেছে। সেইসব

চিত্রের মাধ্যমে তাদের ছোট ছোট জীবন-কাহিনী | সীমন্তিনী ঠিকই বলেছে এ যেন প্রাগৈতিহাসিক ফেসবুক | চিত্রাঙ্কনের উপকথা বিশ্লেষণ করে শীতাংশু এই উপমানবদের একটা

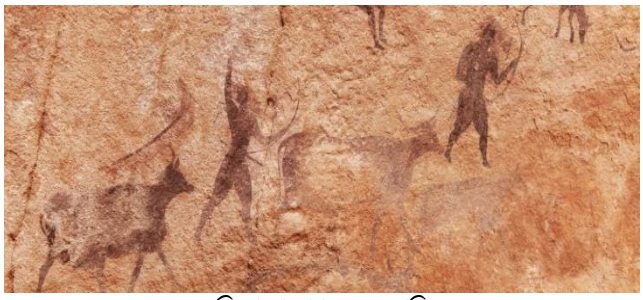

নিয়্যান্ডারথ্যালের গুহাচিত্র

যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে – একদল হিংস্র নরখাদক অতিমানব এই শান্তিপ্রিয় উপমানবদের বনের পশুর মতো শিকার করেছিল | গুহার কোণে একটা পাথরে শীতাংশু দেখেছে এক ভয়ংকর জীবনের দৃশ্য – মানব, মানবী আর একটি ছোট বাচ্চা; মানবীর ভরা গর্ভাবস্থা | নরখাদক মানুষরা শিকারে আসছে | তাদের ভেরির শব্দ শুনে মানব লতার সাহায্যে গর্ভবতী মানবী আর ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়েছে গভীর গহ্বরে | শিকারীরা বলিদানের জন্য ধরে নিয়ে গেছে মানবকে | ঠিক সেই সময় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ – ভয়ে সকলে দিগ্বিদিকে বিচ্ছুরিত হয়েছে | ছাড়া পেয়ে মানব ছুটেছে মানবী আর বাচ্চাকে উদ্ধার করতে | পথে আকাশচেরা বৃষ্টি, পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে ক্রমশ ভরে উঠছে গুহা | মানবীর প্রসব বেদনা | অর্ধজাত শিশু, মানবী আর ছেলে জলে নিমগ্ন | গুহাচিত্রের এই জীবনলিপি সীমন্তিনী সুচারুভাবে তার অঙ্কনে যথাযথ তুলে ধরেছে |

তারা ফিরে এসেছে হার্ভার্ডে | দুজনেই পিএইচডি থিসিস্ লিখেছে | শীতাংশুর বিষয়বস্তু হ'ল 'Cause of Neanderthal Extinction', আর সীমন্তিনীর 'Life of Neanderthal in Cave Paintings'| সীমন্তিনীর থিসিস সে বছরে 'বেস্ট হার্ভার্ড থিসিস্' হিসেবে সম্মানিত হয়েছে |

কমেন্সমেন্টের পর শীতাংশু আর সীমন্তিনী একটা কফির দোকানে বসে কফি আর পেস্ট্রি খাচ্ছে | তাদের কথাবার্তা চলছে – শীতাংশু বলে উঠেছে, 'একেই বলে ভাগ্য! গেলি আমার কাজে চিত্রাঙ্কন করে সাহায্য করতে, আর পেয়ে গেলি বেস্ট থিসিস্ পুরস্কার! তবে সত্যি বলছি, আমি কিন্তু প্রাণ থেকে খুশি!'

- 'তোমার প্ল্যান কী এর পর?' সীমন্তিনী কেমন যেন গম্ভীর হয়ে রয়েছে | এত বড় সম্মান – উল্লসিত হবে, তা কিনা...

- 'তোকেই প্রথম বলছি | তা নাহলে আবার কেঁদে ভাসাবি আর আমার শ্রাদ্ধ করবি |'

- 'কী প্ল্যান, তাড়াতাড়ি বলো, হেঁয়ালি করো না |'

- 'প্ল্যান কি সব আমার হাতে? প্রফেসর স্টাইনহার্ট কমেন্সমেন্টের পর একটা পোস্ট ডক্টরাল অফার দিয়েছেন | তাঁর বিশ্বাস দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন জঙ্গলে এখনও নিয়্যান্ডারথ্যাল উপমানব বসবাস করে | আমার কাজ হবে তাদের খুঁজে বার করা আর... থাক, ডিটেলটা আর বললাম না |'

- 'কী অ্যাসাইনমেন্ট? নিশ্চয় খুব ভয়াবহ?'

- 'এক্কেবারেই ভয়াবহ নয় | উনি বর্তমান মানুষ আর উপমানব নিয়্যান্ডারথ্যালের DNA ম্যাপিং করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তাদের মধ্যে প্রজনন হওয়া সম্ভব নয় | আমাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে |'

- 'বাব্বাঃ, এবার হিউম্যান গিনিপিগ হয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি করবে!'

- 'দেখ, বুড়োর ভীমরতি ধরেছে – ভাবে কিনা উপমানব নিয়্যান্ডারথ্যালরা এ যুগেও পৃথিবীতে বাস করছে | সেটা একটা বাতুলতা মাত্র! তবে ভাবলাম ডিপার্টমেন্ট গ্র্যান্টের খরচে অ্যামাজন দেখা হয়ে যাবে | তিনি আবার বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, পেরুর অ্যামাজন, ব্রেজিলের নয় |'

- 'কবে যাবে ঠিক করেছ?'

- 'ভাবছি আসছে সপ্তাহে | জানিস তো আমার 'আপনি আর কোপনি', শুধু মায়ামি থেকে কয়েক ফাইল অ্যান্টিভেনম সিরাম আনাতে হবে | জঙ্গলে বিষাক্ত সাপের খুব উপদ্রব | ট্র্যাভল এজেন্টকে কল করে বস্টন-নিউইয়র্ক-লিমা-Iquitos বুকিংটা সেরে ফেলতে হবে | Iquitos থেকে স্টিম লঞ্চে বর্তমান মানব সভ্যতার শেষ প্রান্তে – তারপর অ্যামাজন জঙ্গলে পায়ে হাঁটা | তোর কী প্ল্যান রে?'

- 'বাবার চিঠি এসেছে | আমার বিয়ের সব ঠিক | আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি | কোনও একটা কলেজে পড়াব |'

- 'সেকী! তোর বিয়েতে থাকতে পারব না? বেশ কেমন

অনেকগুলো কড়াপাকের সন্দেশ খেতাম...| আর তোকে ছাদনাতলায় তুলে ধরতাম শুভদৃষ্টির সময়, বরের চেয়ে অনেক উঁচুতে!'

- 'আমায় এখন যেতে হবে গোছগাছ করতে | ভাবী স্বামী নিউ ইয়র্কে আসছেন কাজে | উইকএন্ডটা নিউ ইয়র্কেই কাটাব | তোমার সাথে যাবার আগে বোধহয় আর দেখা হবে না |'

- 'তোর জন্য আমার প্রাণভরা শুভেচ্ছা রইল | যে জায়গায় যাচ্ছি সেখান থেকে কংগ্র্যাচুলেশনস্ কার্ড বা উপহার পাঠাবার উপায় নেই | পলার এই আংটিটা আমি বাবার মৃত্যুর পর তাঁর আঙুল থেকে খুলে নিয়েছিলাম; এটা তুই রাখ | এটা আমার জীবনে সবথেকে মূল্যবান এবং প্রিয় জিনিস | তোকে দিলাম | তোর বাচ্চা হবার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষয় থেকে বাঁচাবে |'

আংটিটা শীতাংশুর হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে সীমন্তিনী | এরকম আকস্মিক ব্যবহারে শীতাংশু বিহ্বল হয়ে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আছে |

দেখা করেনি সীমন্তিনী | শীতাংশু অনিশ্চিত যাত্রার তোড়জোড়ে ব্যস্ত; তবু সে সীমন্তিনীর মোবাইল ফোনে দুটো ম্যাসেজ রেখেছিল | সীমন্তিনী তার কোনও উত্তর দেয়নি | শীতাংশু ভেবেছে সে বোধহয় ভাবী স্বামীর সঙ্গে দেশেই ফিরে গেছে | এতদিন একসঙ্গে কাটিয়ে ওর সীমন্তিনীর ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে | দুদিন ধরে তার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে চারদিক | নিজের এইরকম বাউন্ডুলে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে |

নিউ ইয়র্ক থেকে লিমার ফ্লাইট দশ ঘন্টার | সমুদ্রতটে কুয়াশায় ঢাকা লিমা শহর | ইঙ্কা সভ্যতার প্রতীক! কিছুক্ষণের মধ্যেই Iquitos-এর ফ্লাইট | আজ কিচ্ছু ভাল লাগছে না তার | Bar-এ গিয়ে তিনটে Pisco খেয়ে মাথাটা একটু টলছে | Andes পর্বতমালার পাশ ঘেঁষে প্লেনটা ছুটে চলেছে সভ্য

মানুষের শেষ বসতি Iquitos-এর দিকে | মনে হচ্ছে সীমন্তিনী বড্ড প্রাক্টিক্যাল – পিএইচডি শেষ করেই তাকে বিয়ে করতে হবে! অ্যামাজন জঙ্গলে কোনও গুহায় নিশ্চয়ই কোন চিত্রাঙ্কন নেই, যার জন্য সীমন্তিনীকে দরকার হতে পারত!

প্লেন নেমেছে Iquitos-এ | একটা ব্যাকপ্যাক ছাড়া শীতাংশুর আর কোনও মালপত্র নেই | খড়ের চালের কাস্টম অফিস | কাস্টম শেষে সে চলেছে অ্যামাজানের স্টিম লঞ্চ ধরতে | দিনে একটাই লঞ্চ ছাড়ে | লঞ্চের টিকিট কিনে সে উপরের ডেকে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছে | নদী থেকে গাঢ় কুয়াশা এসে ডেকটাকে ঢেকে ফেলেছে | শীতাংশু ভাবছে লঞ্চটা যাবে কী করে! আশপাশের মানুষও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না | আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে পাশের ডেকচেয়ারে কেউ একজন এসে বসেছে | শীতাংশু উঠে যাবে ভাবছিল; আচমকা একটা ভারী জিনিস কোলের ওপর এসে পড়ল | হাতড়ে পেল বাবার পলার আংটিটা | সীমন্তিনী হাসছে | শীতাংশুর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, 'প্রজনন করতে এসেছি |'

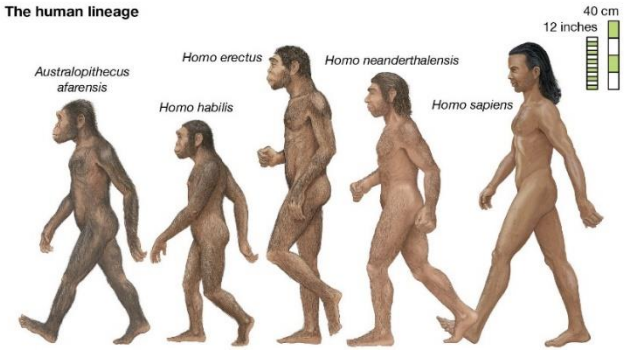

বোধন

অদিতি ঘোষদস্তিদার

আকাশটা সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে। একবার চোখ খুলে দেখে নিয়ে পাশ ফিরলেন বিমলবাবু। সবে ঘুমের আমেজটা এসেছে এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ।

গিন্নি আর বাকি সবাই দোতলায়। দরজা খুলতে গেলে বিমলকেই উঠতে হবে।

খানিকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই। ঘুমের ঘোরে হয়তো ভুল শুনেছেন – এই ভেবে চোখ বুজতে যাবেন আবার কড়া নাড়া! এবার পরপর দুবার।

এর পর উঠতেই হবে! নয়তো ওপর থেকে বজ্রনিনাদ আসবে, 'এই সাত সকালে আবার কে এল!'

ধুত্তেরি! গজগজ করতে করতে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুললেন বিমলবাবু। দরজার সামনে একটি মহিলা আর একটি দশ-বারো বছরের ছেলে। অভাবের ছাপ দুজনের চেহারাতেই স্পষ্ট। বৌটির পরনে একটা পুরনো ছাপাশাড়ি। হাতে প্লাস্টিকের দুজোড়া ময়লা শাঁখা ছাড়া শরীরে কোন অলঙ্কার নেই। ছেলেটার পরনে হাফপ্যান্ট আর একটা হাতকাটা গেঞ্জি।

ঘুমচোখে প্রথমটায় ঠিকমতো চিনতে পারলেন না বিমল।

- "কে তোমরা? কী চাও এত সকালে?"

মহিলাটিই মুখ খুলল, "আজ্ঞে বাবু, আমি সনকা। ও হাবুল, আমার ছেলে। ফি বছর তো আসি এরকম সময়। চিনতে পারছেন না বাবু?"

বিমলের কোঁচকানো ভুরু দেখে হাবুল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি কৈবত্ত পাড়ার দুলে বাগদির ছেলে বাবু, এই হচ্ছে আমার মা।"

- "বেলতলা সাফ করতি এলুম গ বাবু। কালই ত গেল সেই দিন। অ হাবুল, বল না বাবা, কী যেন বলে, আমার আবার জিভ ঘোরে না।"

- "মহালয়া, মা।"

এইবার ঘটনাটা পরিষ্কার হ'ল।

বাগদিরা বোধনের আগে বেলগাছতলা তকতকে ঝকঝকে করবে, এ নিয়ম চালু সেই বিমলের ঠাকুরদার আমল থেকে। বিনিময়ে টাকাপয়সা, নতুন জামাকাপড় পাবে, পুজোর চারদিন ভোগ খাবে দু'বেলা। তারপর ঠাকুর জলে পড়লে পাবে একটা বড় সিধা। পুজোর চাল, ডাল, তেল, আনাজ, ফলমূল মিলে প্রায় মাসখানেকের খোরাক। মহালয়ার পরের দিনই তাই চলে আসে ওরা বরাবর। রোজ কিছুটা করে পরিষ্কার করে পঞ্চমী পর্যন্ত। দুলে আসতে পারছে না বছর দুই, শয্যাশায়ী। তাই এরা।

বিমলবাবুর বিরক্ত লাগে। ঠাকুরদার নিয়ম বাবা মেনেছেন, তাই তিনিও মানতে বাধ্য। শরিকের পুজো। পয়সা খরচ নিয়ে কোন চিন্তা নেই। কিন্তু পূজামণ্ডপের কাছাকাছি থাকেন একমাত্র তিনিই, তাই কাজকর্মের ঝক্কি সব একলার ঘাড়ে। এইসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ কন্ট্রাক্টে কাউকে দিয়ে দিলে তো আর কোনদিক দেখতে হয় না। পয়সা ফেলে দিলেই হ'ল। সে হবার জো নেই! এদের দিয়েই কাজ করাতে হবে। বাবা এখনও বেঁচে। অন্যথা হবার উপায় নেই। একবার কথাটা পেড়েও ছিলেন আমতা আমতা করে, কিন্তু বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওদের এটা তো একটা বচ্ছরকার রোজগার, কেড়ে নিবি কেন বাবা? আনন্দময়ী ক্ষুণ্ন হবেন!"

ব্যস! হয়ে গেল! তাই দাঁড়িয়ে থেকে কাজের নজরদারি, দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত সবটি নিজেকে করতে হয়। তার ওপর গিন্নির হাঁড়িমুখ দেখা আর গজগজ শোনা।

- "কাজ শুরু করি বাবু?"

হাবুলের প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরল। তবে বিমলের মন খুশি খুশি। এক্ষুনি অবশ্য কাজ করাতে হবে না। এবছর আশ্বিন মাস মলমাস। মহালয়া আর বিশ্বকর্মা পুজো একদিনে হয়েছে গতকাল, ভাদ্র সংক্রান্তিতে। পুজো সেই কার্তিক মাসে। এদের বিদেয় করে বিছানায় আরো খানিক সময় গড়ানো যাবে।

- "শোন, এখন কাজ নেই, এবছর পুজো মহালয়ার একমাস পর; আমি জানাব কোনদিন আসতে হবে। এখন যা।"

দরজা বন্ধ করে দিলেন বিমলবাবু।

ঘুমের বারোটা বেজেছে। বিছানায় শুয়েও ঠিক ভাল লাগল না। উঠে পড়ে চা বসিয়ে দিলেন তিনি। চা খেয়ে বাথরুম সেরে বেরিয়ে পড়লেন হাঁটতে। এতক্ষণে দিনের আলো বেশ ফুটে গেছে। বেলতলাটা বাড়ির কাছেই। একটু এগোতেই চোখে পড়ল বেলগাছের নিচে দাঁড়ানো দুটি মূর্তি।

আরে? দুলের বৌ আর ছেলেটা না ওখানে?

- "এই, কী করছ এখানে? বললাম না কাজ হবে না!"

সনকা ভয় পেল।

- "ও হাবুল, চলে আয় বাবা! বাবু বকতেছে!"

রোগা চেহারার হাবুল তখন বেলগাছের গায়ে ওঠা মোটা আগাছার লতাটা টেনে ছিঁড়তে গিয়ে ঘেমেনেয়ে একশা।

বিমল রেগে চেঁচালেন, "বারণ করলে কথা শুনিস না কেন তোরা? এখন সাফ করলে আবার তো জঙ্গল হবে একমাসে। ডবল পয়সা কে দেবে তোদের?"

গামছা দিয়ে ঘাম মুছে হাবুল উত্তর দেয়, "ডবল পয়সা লাগবে না বাবু।"

"লাগবে না বাবু!" বিমল ভেংচি কেটে উঠলেন।

"তোদের আমি চিনি না ভেবেছিস, এখন চুপচাপ চলে যাবি, তারপর পুজোর সময় একবাড়ি লোকের সামনে হুজ্জুতি করবি পয়সা নিয়ে। যা যা সোজা বাড়ি যা।"

হাবুল একটু এগিয়ে এল। সনকা ওর হাতটা ধরে আটকাতে চাইল কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছেলেটা কেমন করুণ একটা মুখ করে বলে উঠল, "চলেই যাচ্ছিলাম বাবু, যেতে যেতে বলছিলুম গাছটাকে, 'আরো একমাস অপেক্ষা করতে হবে!' বলেই মনটা কেমন যেন করে উঠল। ভাবলুম বেলগাছটাও তো ঠিক আমাদেরই মতো সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে কবে মহালয়া আসবে, আর ও সাজবে। তাই আগাছাগুলো টেনে সাফ করছিলুম বাবু, মা বকছিল কিন্তু...."

সনকা চোখ পাকাতে থেমে গেল মাঝপথে হাবুল।

বিমল তাকালেন গাছটার দিকে। রোজই তো হাঁটতে আসেন এদিকে, নজর করা হয়নি তো! সত্যিই বড্ড জঙ্গল হয়েছে, জংলি মোটা লতা উঠে পড়েছে অনেকটা ওপরে, তারই খানিকটা হাবুল টেনে নামিয়েছে। তাও সবুজ পাতায় আর কচি কচি বেলে গাছটা ভরা। ওই পাতার মালাই তো গলায় উঠবে চণ্ডীমণ্ডপের দেবীর।

মনের মধ্যে একটা অজানা অনুভূতি হচ্ছে। গাছটার দিকে তাকাতেও এখন কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হচ্ছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে হাবুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিমল। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "আচ্ছা কর সাফ, তলার দিকে যতটা পারিস। বেশি ওপরে উঠতে হবে না। আর শোনো গো হাবুলের মা, কাজ হয়ে গেলে বাড়িতে এসো। আমি ফিরে আসব ততক্ষণে। আজকের কাজের পয়সা নিয়ে যেও। আর গতকাল বাড়িতে রান্নাপুজো হয়েছে। দুজনে প্রসাদ খেয়ে দুলের জন্যে নিয়ে তারপর বাড়ি যেও, কেমন!"

কথাগুলো বলেই আর না দাঁড়িয়ে হাবুল আর সনকার হতভম্ব দৃষ্টির সামনে দিয়ে হনহন করে হেঁটে এগিয়ে গেলেন বিমল।

বেলগাছের পাতাগুলো হাওয়ায় দুলে দুলে খুশিতে যেন মাতোয়ারা! শরতের আকাশে রোদের সোনা এখন আরো চকচকে!

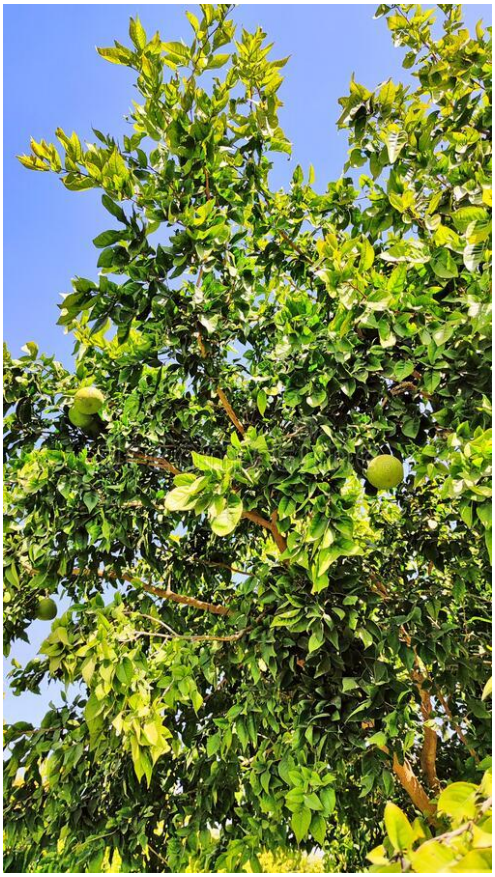

শেষ নাহি যে

মৌ পাল

রেল স্টেশনের বেঞ্চে চুপ করে বসেছিলেন নির্মলবাবু | রোজকার মতো ট্রেন আসছে যাচ্ছে, প্ল্যাটফর্মে মানুষের থিকথিকে ভীড় | অবসরের পর থেকে বিকেলের এই সময়টুকু তাঁর খুব প্রিয় ছিল | একটা মজার খেলা খেলতেন প্রশান্ত আর তিনি | লোকগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা আর আন্দাজ করা কে কোথায় যাচ্ছে, কী ভাবছে | কিন্তু আজ সেই খেলার সাথীই হারিয়ে গেছে | ঝাপসা হয়ে ওঠা চশমার কাঁচটা একবার মুছে নেন নির্মলবাবু|

কত দিনকার কথা সেসব! বদলি নিয়ে বাবা চলে এলেন খড়দাতে | এখনো মনে আছে, হেডস্যার নিজে তাঁকে ক্লাস ২-এর শ্রেণীকক্ষে নিয়ে এসেছিলেন; বলেছিলেন, "এই যে, এই ছেলেটি আজ থেকে স্কুলে ভর্তি হ'ল | তোমরা তোমাদের নতুন বন্ধুকে আপন করে নিও কিন্তু |" কেন যেন মনে হয়েছিল, কোণের বেঞ্চের ওই এক মাথা কোঁকড়া চুলের ছেলেটি বেশ ভাল | গিয়ে বসলেন তারই পাশে | তারপর জানা গেল ওরা নির্মলবাবুর পাড়াতেই থাকে | নামে যেমন প্রশান্ত, স্বভাবেও তেমনি শান্ত ছিল ও | ডানপিটে ছিলেন বরং উনি নিজে | ধীরে ধীরে দুজনে হরিহর আত্মা হয়ে উঠলেন | কত যে কীর্তি ছিল দুজনের! সেই স্কুল পালিয়ে উত্তমকুমারের সিনেমা দেখতে যাওয়া, আর তারপর ধরা পড়ে বাবা-কাকার হাতে একসাথে মার খাওয়া!

পড়াশুনায় অবশ্য দুজনেই বেশ ভাল ছিলেন | নির্মলবাবু স্কুল পাশ করে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেলেন ব্যাঙ্গালোরে | তারপর ওখানেই চাকরি নিয়ে বসবাস | প্রশান্ত অবশ্য খড়দার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি | একটা চলনসই সরকারী চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন | ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেই কাটিয়ে দিলেন এতগুলো বছর | সেইজন্যই বোধহয় রেল স্টেশনের প্রতি তাঁর এত মায়া, আর নির্মলবাবুকেও এই নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি | প্রশান্তর সাথে নির্মলবাবুর যোগাযোগ ভালমতোই বজায় ছিল | মা-বাবার জীবদ্দশায় নির্মলবাবু ছুটি-ছাটায় এখানে নিয়মিত আসতেন তাঁদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে |

তারপর পাঁচ-ছয় বছর আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখানেই সস্ত্রীক ফিরে আসলেন | এই সিদ্ধান্তের পিছনে অবশ্যই প্রশান্তর এখানে থাকাটাও একটা বিশেষ কারণ হিসাবে কাজ করেছিল | আসলে সংসারে তো শুধু তাঁর গিন্নি আর তিনি; সন্তানসুখ ভগবান তাঁদের কপালে লেখেননি | সুতরাং আপনজন বলতে কেবল এই বাল্যবন্ধুরা আর পুরনো পাড়ার লোকজন | ওদিকে প্রশান্তরও ঝাড়া হাত-পা | মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে | একমাত্র ছেলে এখানেই থাকে স্ত্রীকে নিয়ে | নাতিও আছে একটি, তবে সে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করে |

অতএব দুই বাল্যবন্ধু যেন আবার ফিরে গিয়েছিলেন ছোটবেলার দিনগুলিতে | দুই গিন্নির মধ্যেও বেশ ভাব | মাঝে মাঝেই গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়েন চারজনে | কাছাকাছির মধ্যে ঘুরে আসেন কোথাও | এছাড়া প্রত্যেক দিনের ধরাবাঁধা দেখাসাক্ষাৎ তো আছেই | ছোটবেলা থেকেই দুজনে দাবা খেলতে ভালবাসতেন | দুজনের কেউই তেমন পটু নন, কিন্তু খেলায় খুব আগ্রহ | বেশ নিরিবিলি বলে আসরটা বেশিরভাগ সময় নির্মলবাবুর বাড়িতেই বসত | প্রত্যেকদিন বিকেলে দুই বন্ধু এসে এই রেলস্টেশনে বসতেন | তারপর পাঁচটা দশের লোকালটা চলে যাওয়ার পর তাঁরা গুটি গুটি পায়ে হেঁটে নির্মলবাবুর বাড়িতে যেতেন | ততক্ষণে গিন্নির দ্বিপ্রাহরিক ঘুম সাঙ্গ হয়েছে | বৈকালিক চা সহযোগে নির্মলবাবুর অফিস ঘরে বসত দাবার আসর | দুজনেই উনিশ-বিশ; ফলে কোনদিন নির্মলবাবু জিততেন, কোনদিন প্রশান্ত | একেকদিন এক-দুই ঘন্টা পার হয়ে যেত, তবু মীমাংসা হতো না | যেমন পরশুদিন – দু'ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছিল | মন্ত্রী হারিয়ে নির্মলবাবু বেশ কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন | প্রশান্ত একটা বেশ জুতসই চাল দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাড়ি থেকে ফোন | স্ত্রীর তাড়ায় প্রশান্তবাবুকে উঠতেই হ'ল | কিন্তু বলে গিয়েছিলেন, "নিমু, কাল এসে তোকে কিস্তিমাত করছি |"

কিন্তু, ভাগ্যের কী পরিহাস! সেদিন ভোররাত্রে প্রশান্ত নিজেই জীবনযুদ্ধে কিস্তিমাত হয়ে গেলেন | রাত্রে প্রশান্তর ছেলের ফোন এসেছিল; ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা দুজন | কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ | ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক | সারাদিন ছুটোছুটি চলল | খবর পেয়ে প্রশান্তর মেয়ে এসে উপস্থিত হ'ল | তারপর বিকেলের মধ্যে চিতার আগুনে

শেষ হয়ে গেল পঞ্চাশ বছরের বেশি সম্পর্ক। গোটা দুদিন ধরে একটা দমচাপা কষ্ট নির্মলবাবুর বুকের মধ্যে।

আজ যেন কী একটা ঘোরের মধ্যে ঠিক চারটে বাজতেই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে। শোকতপ্ত মন নিয়ে গিন্নি বোধহয় পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; নাহলে কিছুতেই ওঁকে আসতে দিতেন না। কিন্তু অভ্যাসের বশে আসলেও বিক্ষিপ্ত মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। অলীক আশা, তবু মনে হচ্ছিল বেঞ্চের ঠিক বাম পাশটিতে সে এসে বসবে। সেই স্কুলের সময় থেকে ওঁর বাঁপাশের সিটটিতে বসত প্রশান্ত। এখানেও তাই নিয়ম ছিল। তারপর সেই হাস্যোজ্জ্বল গলায় বলে উঠবে, "ওই যে দেখ, ওই লাল মাফলারপরা বিষণ্ণ মুখের লোকটা, যে তাড়াহুড়ো করে দুই পায়ে দুই রকম জুতো পরে ট্রেনে উঠল, নির্ঘাত বাড়ি থেকে বউয়ের সাথে ঝগড়া করে বেরিয়েছে।"

কিন্তু না, ইঁট-কাঠের পৃথিবীটা যে বড্ড কঠিন বাস্তব! তাই পাঁচটা পনেরোর ট্রেন চলে যেতে নিয়মমাফিক একাই ধীর পায়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন নির্মলবাবু। সদর দরজাটা ঠেলে দেখলেন বাড়ির ভিতর এখনো অন্ধকার। গিন্নি হয়তো এখনো ঘুম থেকে ওঠেননি। নিঃশব্দে অফিস ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলেন। সেই দিনটার পর আর এই ঘরে তো আসাই হয়নি। আলো জ্বালতেই চোখে পড়ল টেবিলের উপর সেদিনের সাজানো দাবার বোর্ডটা। দুই বন্ধুর অসমাপ্ত খেলা পড়ে রয়েছে। প্রশান্ত আর কোনদিন তাঁকে কিস্তিমাত করতে পারবে না। কিন্তু এটা কী! দাবার বোর্ডটা একটু যেন অন্যরকম লাগছে! নির্মলবাবুর স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। এত শোকের মাঝেও ওঁর মনে পড়ল যে প্রশান্তর মন্ত্রী তো এখানে ছিল না! আরে! প্রশান্ত তো ওকে কিস্তি দিয়েছেন মন্ত্রী দিয়ে। এ কী করে সম্ভব! নির্মলবাবু হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন। বাড়িতে তো গিন্নি ছাড়া কেউ নেই আর তিনি এসবে হাত দেন না কখনই। ঘর থেকে বেরিয়ে গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করতে যাবেন, এমন সময় শুনলেন বাইরে গিন্নির গলা, "ওঃ, তুমি ফিরেছ তাহলে? কোথায় গিয়েছিলে বলো তো? দুশ্চিন্তায় আমার তো মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ফোন করেও পাচ্ছি না। তারপর ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম, ভাবলাম ওখানেই হয়তো গেছ। সেখানে না পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি।"

গিন্নি হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু নির্মলবাবুর ফ্যাকাসে মুখটা দেখে বললেন, "কিছু হয়েছে নাকি গো?"

নির্মলবাবু বললেন, "আচ্ছা ললিতা, তুমি কি এই দাবার বোর্ডে হাত দিয়েছিলে?"

- "কখনই না। আমি কি দাবা খেলতে জানি নাকি?"

নির্মলবাবু ব্যাপারটা স্ত্রীকে বলতে গিয়েও চেপে যান। হয়তো ললিতা বিশ্বাস করবে না বা অকারণ দুশ্চিন্তা করবে। সত্যিই কি তবে প্রশান্ত এসেছিল খেলাটা শেষ করতে? তারপর নিজেই নিজেকে ধিক্কার জানালেন। শোকে তাঁর মাথাটাই বোধহয় কাজ করছে না। এও সম্ভব হয় নাকি কখনও! তবু স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কী ভেবে দাবায় পরের চালটি দিয়ে দিলেন তিনি। সেই রাত্রিটা নির্মলবাবুর প্রায় নির্ঘুম কাটল।

সকাল হতেই ছুটলেন অফিস ঘরে দেখতে যে নতুন কোন চাল পড়ল কিনা। নাহ, দাবার বোর্ড যেমনকার তেমনই পড়ে আছে। ভাবলেন, তাহলে আমারই মনের ভুল ছিল।

আজও বেরোলেন স্টেশনের দিকে, অবশ্য গিন্নিকে বলে। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে ফিরে কীসের এক টানে প্রথমেই ছুটে গেলেন অফিস ঘরে। কী আশ্চর্য, প্রশান্তবাবুর দিকে পরের দানটি দেওয়া রয়েছে। এবার তো কোন সন্দেহ রইল না। নির্মলবাবু ছুটলেন রান্নাঘরে।

- "আচ্ছা ললিতা, সত্যি করে বলো তো তুমি দাবার বোর্ডে হাত দাওনি?"

ললিতা একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন স্বামীর দিকে – "তোমার কী হ'ল বলো তো?"

ঘটনাটা বলতে গিয়েও নির্মলবাবু সামলে নিলেন নিজেক। বদলে জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ কি এসেছিল এখন বাড়িতে?"

- "ওহো, বলতে ভুলে গেছি, কুমার এসেছিল তোমার সাথে কি একটা পরামর্শ করতে। আসলে প্রশান্তবাবু চলে যাওয়ার পর ও তোমাকেই এখন অভিভাবক হিসাবে দেখে কিনা।"

নির্মলবাবু তখনি ছুটলেন প্রশান্তবাবুর বাড়িতে। কুমারের সাথে কথা হওয়ার পর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, "আচ্ছা কুমার, তুমি কি কাল বা আজ কোন কারণে আমার অফিস ঘরে ঢুকেছিলে, আর আমার দাবার বোর্ডে হাত দিয়েছিলে?"

- "না তো কাকাবাবু, আসলে দাবা আমার ভাল লাগে না একটুও, খেলতেও জানি না তেমন। বাবার যদিও খুব নেশা ছিল। কিন্তু

কেন বলুন তো কাকাবাবু?"

নির্মলবাবু কুমারকে একটা মনগড়া অজুহাত দিয়ে সেখান থেকে বাড়ি চলে আসেন।

অফিসঘরে এসে দাবার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, "প্রশান্ত তুই কি তবে সত্যিই এসেছিলি?" কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। মনে মনে একটা ফন্দি এঁটে আজ তিনি পরের চালটা দিলেন। ইচ্ছা করেই একটা খুব বাজে চাল দিলেন। এমনিতেই তো খেলাটাতে তাঁর অবস্থা বেশ শোচনীয় ছিল। এবার এমনভাবে দান দিলেন যে একটু মাথা খাটালেই যে কেউ তাঁকে কিস্তিমাত করতে পারবে।

পরের দিন বিকেলে যথারীতি স্টেশনে গেলেন। কিন্তু আজ পুরো সময়টা ওখানে না কাটিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। ওঁর মন বলছিল এই সময়েই কিছু একটা ঘটছে দাবার চালে। আস্তে আস্তে সদর দরজা খুলে অফিসঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজাটা একটু খোলা আছে না? ঘরে কোন আলো জ্বলছে না; শীতের বিকেলের অনুজ্জ্বল আলোতে দেখলেন তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাবার বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নয়-দশ বছরের একটি ছোট ছেলে। নির্মলবাবুর পায়ের শব্দে চমকে উঠে ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ায়, তার হাতে ধরা একটি দাবার ঘুঁটি।

- "ইশ, কী বাজে চাল দিয়েছ গো তুমি! এখনি তো কিস্তিমাত হয়ে যাবে।"

একটু সামলে নিয়ে নির্মলবাবু বলে ওঠেন, "কে রে তুই?"

- "আমি তো প্রণীত, নির্মলদাদু। চিনতে পারছ না? আসলে এবার আমি অনেকদিন বাদে বোর্ডিং স্কুল থেকে এলাম, আর শেষবার যখন এসেছিলাম, তোমরা তো বেড়াতে গিয়েছিলে, তাই দেখা হয়নি।"

নির্মলবাবু এবার চিনতে পারলেন। তাইতো এ তো পিনু! প্রশান্তর নাতি। আসলে বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়াশোনা করে বলে খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না। বেশ লম্বাও হয়ে উঠেছে ছেলেটা, চেনা মুশকিল।

- "তাহলে পিনু, তুমিই এই কদিন দাবার চাল দিচ্ছিলে?"

প্রণীত একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, "হ্যাঁ তো। তোমাদের খিড়কী দরজা খোলাই থাকে। সেদিন ঠাকুমা আমাকে পাঠিয়েছিল ললিতাদিদাকে ডেকে আনতে। আমি খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি কেউ নেই বাড়িতে। কিন্তু অফিসঘরে দাবার বোর্ডটা দেখে চাল দেওয়ার লোভ সামলাতে পারিনি। টুক করে চাল দিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখি ললিতাদিদা তোমাকে খুঁজতে আমাদের ওখানেই গেছে। আর কাল এসেছিলাম বাবার সাথে; এক ফাঁকে তোমার অফিসঘরে ঢুকে দানটা দিয়ে দিয়েছিলাম। আজও খিড়কীর দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছি।"

এবার সব বুঝতে পারলেন নির্মলবাবু। প্রণীতের এখানে আসার কথাটা বাহুল্যবোধে ললিতা বা কুমার কেউই তাঁকে জানায়নি কাল; নাহলে ব্যাপারটা আগেই পরিষ্কার হয়ে যেত। একটা খটকা কিন্তু কিছুতেই যাচ্ছে না।

- "আচ্ছা পিনু, তুমি কী করে জানলে যে তোমারই চাল দেওয়ার কথা ছিল।"

প্রণীতের মুখটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বলল, "সেদিন রাত্রেই তো দাদাইয়ের সাথে ফোনে কত কথা হ'ল। আমাকে বলল যে তোমাকে খুব প্যাঁচে ফেলেছে। কিন্তু খেলাটা শেষ হয়নি, কাল গিয়ে এমন একটা চাল দেবে যাতে তুমি কিস্তিমাত।

আসলে, আমি তো স্কুলে সবে দাবা খেলা শুরু করেছি, সেই বিষয়ে দাদাইয়ের সাথে কথা বলতেও খুব ভাল লাগত।

কিন্তু তার পরই তো সব পালটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসা হ'ল। বাড়িতে একটুও ভাল লাগছিল না আমার। তোমার বাড়িতে এসে বোর্ডটা দেখে হঠাৎ মনে হ'ল দাদাই যেন আমাকে বলছে চালটা দিয়ে দিতে।"

নির্মলবাবু সস্নেহে জড়িয়ে ধরেন প্রণীতকে। বললেন, "খুব ভাল করেছ পিনু। এটা তো তোমারই অধিকার।"

- "জানো নির্মলদাদু, আমি এখন থেকে বাড়িতেই থাকব। বোর্ডিং স্কুলে আর ভাল লাগছিল না। তাছাড়া ঠাকুমাও খুব জোর করেছে বাবাকে, আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য।"

- "তাহলে তো খুব ভাল হ'ল, পিনু; এখন থেকে তুমিই হবে আমার দাবা খেলার সাথী। তোমার দাদাই আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। দেখো, আমরাও আর ওকে খেলায় নেব না এবার থেকে।"

- "ঠিক বলেছ নির্মলদাদু, দাদাই ভীষণ দুষ্টু।"

দুজনেরই চোখে জল, মুখে হাসি।

- "কাল তাহলে এই সময় আসছি নির্মলদাদু" বলে প্রণীত বিদায় নেয়।

কিস্তিমাত হওয়া দাবার বোর্ডের সামনে বসে নির্মলবাবু ভাবতে থাকেন –

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে...
পুরাতনের হৃদয় টুটে, আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।"

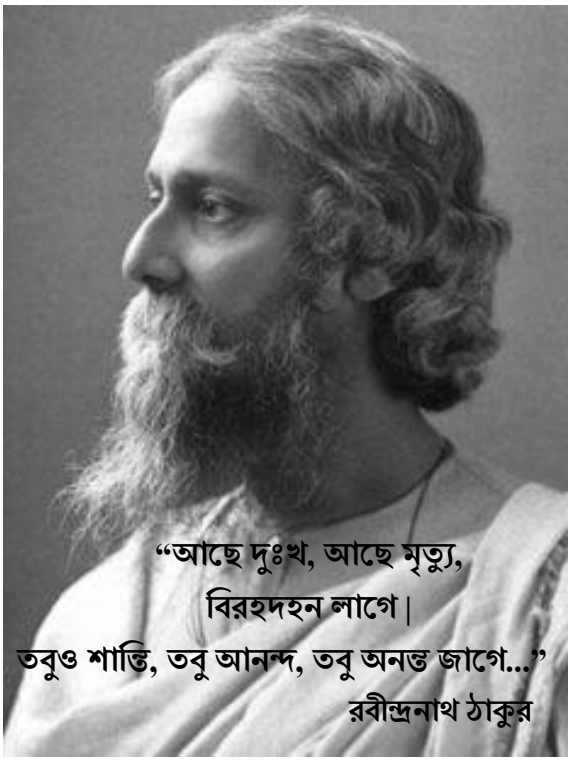

অমল মহিমা লয়ে তুমি এলে, অরুণ প্রভাতে মন ছুঁয়ে গেলে

অনিন্দিতা রায়

কাল টিভির রিমোটটা অন করতেই জী-বাংলায় মহিষাসুরমর্দিনীর প্রোমো চোখে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীর বেয়ে শিহরণ... পুজো তাহলে চলেই এল! হঠাৎ করে রাস্তার ধারে গাড়ির rear-view mirror-এ চোখে পড়ে গেল দিগন্তবিস্তৃত আকাশধোওয়া নীল আর তার কোলে একরাশ কাশফুলের শিরশিরে হাওয়ায় মাথা দোলানো। দেরি না করে একগোছা তুলে নিয়ে এলাম ঘরে... এই সাত সমুদ্র পারে মরুরাজ্যেও পুজো এসে গেছে! মনে পড়ে গেল উৎসবের দিনগুলোর টুকরো টুকরো কোলাজ... আমার বাড়ি, বাগানে স্থলপদ্মের মনকাড়া সুবাস, ফুলেভরা শিউলিতলা, ঢাকের বোল আর নতুন জামার গন্ধ... হ্যাঁ পুজোর একটা নিজস্ব গন্ধ আছে... আছে একটা ঝলমলে আনন্দের রং, আর মহালয়ার এক অদ্ভুত সুরেলা মাদকতা। যদিওবা গুগল সার্চে অনলাইন মহিষাসুরমর্দিনী শোনা রাত পোহালেই চোখ কচলে বিছানায় বসে রেডিওতে মহালয়া শোনাটাকে রিপ্লেস করে দিয়েছে, তবু 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে জেগে উঠেছে আলোক মঞ্জরী'- কথাগুলো শুনলেই সারা গায়ে কাঁটা দেওয়া অদ্ভুত যে এক আবেগ, সেটা কোনদিনও একবিন্দু কম হবে না।

মাদুর্গা বাঙালির কাছে শুধু দেবী নন, তিনি ঘরের মেয়ে – ছেলেমেয়ে, স্বামী নিয়ে যাঁর ভরভরন্ত সংসার। বছর ঘুরলে যেমন মেয়ে বাপের বাড়ি আসে মাতৃরূপে-কন্যারূপে মাও তেমনি আমাদের ঘরে আসেন। বিশ্বকর্মা পুজোর শেষে হালকা হিমেল হাওয়া জানান দিত আর কিছুদিন পরেই মহালয়া – দেবীপক্ষের শুরু। কেন জানি না পুজোর দিনগুলোর চেয়েও মহালয়া থেকে ষষ্ঠী অবধি এই 'পুজো আসছে' ভাবটাই আমার বেশি প্রিয় ছিল। পড়াশুনোর পাট গুটিয়ে নতুন ছেপে বেরোনো আনন্দমেলা পুজোবার্ষিকীর পাতা উল্টোনো, পাশের পুকুরে অজস্র শালুকের ভিড়, সার্বজনীনতলায় জেগে ওঠা মণ্ডপ আর পাড়ার দর্জির কাছে ছিটকাপড় হাতে লাইন – এসব মিলেমিশেই এসে পড়ত আগমনীর দিনগুলো। বাড়ির গেটে ঢুকতেই

শিউলিগাছটা বাগানে ফুল ছড়িয়ে জানান দিত শরৎ এসেছে; মহালয়ার আলো-আঁধারি ভোরে কোঁচড় ভরে তুলে আনতাম সেই একরাশ খুশি | মহালয়ার আগে চারিদিকে চলত অপার প্রস্তুতি – ঘরদোরের ঝুল ঝাড়া, চাদর কাচা, নতুন সাজানো ফুলদানি আর বাগানে নারকেল গাছ থেকে নারকেল পাড়া | মা পাড়ার সবাইকে গাছের নারকেল দিত আর কাকিমনি-জ্যেঠিমার রান্নাঘরে যখন সেই নারকেল ভেঙে তাতে নলেন গুড় ঢেলে কড়াইয়ের গরম আঁচে পাক দেওয়া হতো, তার প্রাণকাড়া গন্ধে ম-ম করত আমাদের গোটা পাড়া |

মহালয়ার আগের দিন আলমারির সব জামাকাপড় বের করে ছাদে রোদে দেওয়া হতো, আর সেইসঙ্গে আমার আর বাবার ডিউটি ছিল ঘরের দেয়ালজোড়া আলমারিগুলোতে থাকা অগুন্তি বইগুলোকে একে একে নিয়ে লম্বা বারান্দায় জলচৌকিতে মাদুর বিছিয়ে রোদ্দুরে দেওয়া | সাথে সাথে টেপ রেকর্ডারে চলত হেমন্ত, মান্না দে বা লতা-আশার পুজোর গান | এর মাঝেই পাড়ার দাদাদের চাঁদা নিতে এসে মাকে অষ্টমীর অঞ্জলির টাইম বলে যাওয়া, নবমীতে নরনারায়ণ সেবার আয়োজনের জন্য বাবার পরামর্শ নেওয়া, নতুন কাকির কাঁচের বোয়ামে দিয়ে যাওয়া সদ্যভাজা নিমকি মুখে পুরে পরম তৃপ্তিতে চিবোনো – এসবই চলতে থাকত | রাতে বাবা অ্যালার্ম দিয়ে রাখত ঠিক ভোর চারটেয় | মশারির ভেতর থেকে আধো ঘুমে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গমগম করা কণ্ঠে, 'যা দেবী সর্বভূতেষু' আর সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে 'বাজল তোমার আলোর বেণু'' শুনতে শুনতেই চমক ভাঙত – মা তাহলে এসেই গেলেন! সকাল হলে বাবা-কাকুর গঙ্গায় তর্পণ করতে যাওয়া, টিভিতে দূরদর্শনে মহালয়ার অনুষ্ঠান দেখা, দুর্গামন্দিরে প্রতিমায় শেষ তুলির আঁচড়, নতুন বানানো জামাটা আরেকবার পরে ঝালিয়ে নেওয়া, সন্ধ্যেবেলা ভাইবোনেরা জড়ো হয়ে গান-আবৃত্তির জমজমাট আসর এসব মিলিয়েই শুরু হয়ে যেত আমাদের শারদোৎসব |

হ্যাঁ পৃথিবীর নানা প্রান্তের দুর্গাপুজো উদযাপনের মধ্যে পার্থক্য আছে | তবু মা আসেন, আমাদের মতো পুজোপাগল মানুষগুলোর কথা ভেবেই আসেন, বাংলাদেশের/ভারতের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে 'রূপং দেহি জয়ং দেহি' মন্ত্রে বিশ্বচরাচর মন্দ্রিত করতে | ক্যাপ-বন্দুক হয়তো নেই – কিন্তু নতুন জুতোর ফোস্কা আছে, রেডিও ঝেড়ে-পুঁছে ফ্রিকোয়েন্সি চেক হয়তো নেই – অনলাইন রেডিও অ্যাপে মহালয়া শোনা অবশ্যই আছে, শিউলিফুল কুড়োনো নেই – কিন্তু বান্ধবীর সাথে লিপস্টিকের শেড আর শাড়ির ম্যাচিং blouse নিয়ে হোয়াটস্অ্যাপে আলোচনা আছে | নারকেল নাড়ু নিজে হাতে বানিয়ে মেয়েকে খাইয়েছি... পুজোর স্বাদ এখানেও আছে – এখনো আছে | আছে আমাদের মননে-চিন্তনে-অস্তিত্বে, তা কখনো যাওয়ার নয় | সময়ের সাথে শুধু মোড়কটা বদলায় মাত্র – স্মার্টফোন হ্যাশট্যাগের মহালয়াই সাথে নিয়ে চলবে মারফি রেডিও-বীরেনবাবুর মহালয়ার ঐতিহ্যকে |

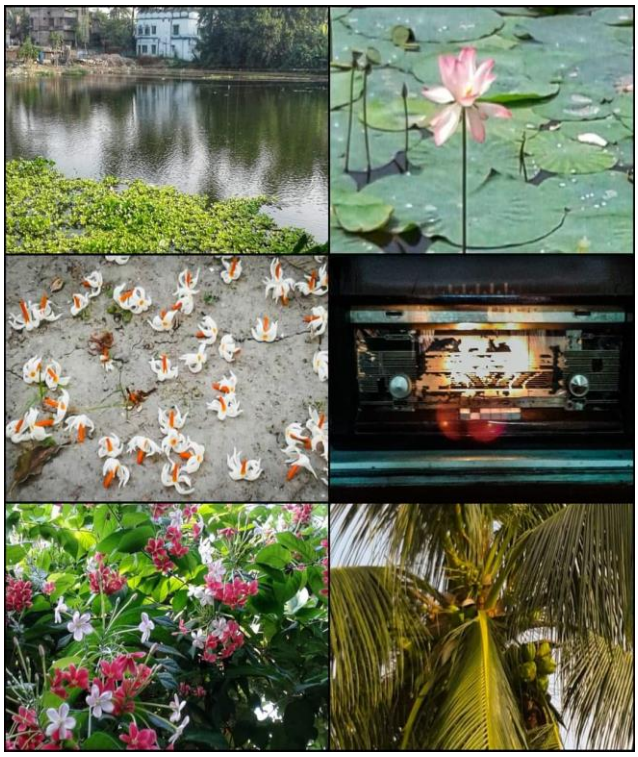

ছবিগুলি আমার সদ্য প্রয়াত বাবার তোলা

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে আমেরিকায় কাজিন গ্রুপের মিলনমেলা

মৃণাল চৌধুরী

ইন্টারনেটের দৌলতে বছর দুয়েক আগে আমাদের দাদু, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে স্মরণ করে এই কাজিন গ্রুপ তৈরি হয়েছে। মূলতঃ আমেরিকা, ভারত, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড এবং মিডল ইস্টে বসবাসকারী কাজিনদের নিয়ে এই দল।

যেহেতু আমাদের দাদুকে কেন্দ্র করে এই কাজিন গ্রুপ, তাই প্রথমে ওঁর বিষয়ে কিছু জানাই।

আমাদের দাদু, শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর জন্ম হয় ১৮৮৬

সালে অধুনা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পেশায় ওকালতি করলেও মনেপ্রাণে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে দাদু পরিচিত ছিলেন – প্রথমে ভারতে, পরবর্তীকালে বাংলাদেশে। ১৯৪৭ সালে তিনি ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেস দলের উপনেতা। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দাদু দীর্ঘকাল করাচী পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন।

দেশভাগের সময়ও দাদু নিজের জায়গা, কুমিল্লা ছেড়ে চলে যাননি; যদিও তাঁর বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ভারতে থাকত। তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে ছিল মাতৃভূমি এবং মাতৃভূমির মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। আবার অন্যদিকে তাঁর মুখে শোনা যেত "এক পৃথিবী"র (ওয়ান ওয়ার্ল্ড) কথা। দাদু ছিলেন ধর্মবর্ণের ঊর্ধ্বে। ১৯৪৮ সালে করাচী পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনেই সংখ্যা-গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তিনি বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান জানান। সেই থেকেই ভাষা আন্দোলনের শুরু – বাংলাদেশ স্থাপনের সূচনা। তবে তার খেসারত ওঁকে দিতে হয়েছিল নিজের জীবনের বিনিময়ে। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে তিনি নিজের হাতে কুমিল্লার বাড়িতে তুলেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ফলস্বরূপ, সেই দাঙ্গায় পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা দাদুকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানের সেনাদের হানা দেওয়ার কথা আগে থেকে জানতে পেরেও আর সকলের মতো দাদু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাননি। এসব কথা আমরা পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর অনুজনদের কাছ থেকে জেনেছি।

এক সময় মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভায় দাদু ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে নানা ষড়যন্ত্রের ফলে সেই মন্ত্রিসভা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। বস্তুত, মন্ত্রিত্বের চেয়ে বন্দী জীবনই ছিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্বাভাবিক অবস্থা। ইংরেজ আমলে দাদু বন্দী হয়েছিলেন অনেকবার, মুক্তিযুদ্ধের আমলেও কারাগারে থাকতে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে মুজিবুর-কন্যা শেখ হাসিনা সরকার "শহীদ" উপাধি দিয়ে তাঁকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন। ১৯৯১ সালে "শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক ডাকটিকিট" প্রকাশ করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনও করা হয়।

দাদু ছিলেন রাজনৈতিক নেতা; ছিলেন দেশের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। ভালমন্দ কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করত না। ঢাকায় পার্লামেন্টের অধিবেশনে বিরোধী পক্ষের এক নেতা দাদুর নামে অভিযোগ তুলে বাইরে এসে বলেছিলেন, "ধীরেনদা, রাজনৈতিক কারণে পার্লামেন্টে অভিযোগ তুলেছি; আপনার নামে কোনো অভিযোগ করা যায় নাকি?" দাদু হেসে বলেছিলেন, "ভালই করেছ।"

দাদুর আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। অনেক সময় করাচী যাওয়ার পথে কলকাতায় ঘুরে যেতেন দাদু। ছেলেমেয়ে বা বোনেদের বাড়িতে না উঠে সাধারণত মির্জাপুর স্ট্রিটের 'আইডিয়াল হোম'-এ থাকতেন। আমরা সেখানে যেতাম দাদুর

সাথে দেখা করতে | কাতারে কাতারে লোকজন আসতেন দাদুকে শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁর সাথে কথা বলতে | এক-দুবার দাদু কলকাতায় এসে আমাদের সুকিয়া স্ট্রিটের ফ্ল্যাটবাড়িতেও ছিলেন | মনে পড়ে, সে কী ভিড়! সিঁড়ি পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত | কীসের আকর্ষণে বা কী কারণে জানি না, মানুষজন একবার অন্তত দাদুর সাথে কথা বলতে চাইতেন | অত ব্যস্ততার মধ্যেও দাদু সকলের সঙ্গে সময় কাটাতে কার্পণ্য করতেন না | এমনকি বাড়ির কাজের লোকদেরও যথাযথ খোঁজখবর নিতে ভুল হতো না | এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব | তাই সারা জীবন বহু মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি |

কাজিন গ্রুপের প্রথম প্রয়াসই ছিল এই মিলনমেলা | দাদুর কথা ভেবেই ওঁর তৃতীয় প্রজন্ম এই প্রয়াসের নাম দেয় "Datta Con 22"| Datta Con 22 লেখা টি-শার্ট তৈরী করিয়ে মিলনক্ষেত্রে পৌঁছানোর সময় ছোট বড় সকলকে সেই জামা বিতরণ করা হয় |

এই সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়াকিবহাল দুজন সদস্য | তারা আপস্টেট নিউ ইয়র্ক ও নিউ হ্যাম্পশায়ার অঞ্চল তাদের বিবেচনার তালিকায় রেখেছিল | অবশেষে আপস্টেট নিউ ইয়র্কের ক্যাটস্কিল (Catskill) পর্বতমালার এসোপাস (Esopus) ক্রিকে অবস্থিত কপারহুড রিট্রিট অ্যান্ড স্পা (Copperhood Retreat and Spa) স্থানটি নির্বাচন করে তারা | এই রিট্রিট অ্যান্ড স্পাটি বেশ কয়েকবার বিশ্বের সেরা দশটি রিট্রিটের মধ্যে একটি বলে বিবেচিত হয়েছে | এখানে ৩২ জন অতিথির জন্য একক এবং গ্রুপের জন্য ১৬টি গেস্টরুম এবং সুইট রয়েছে | এখানে ইনডোর সুইমিং পুল, গরম টব, স্টিমরুম, সনা, ফিটনেস সেন্টার, মেডিটেশন রুমসহ স্পা এবং আউটডোর সুবিধার জন্য সবরকম ব্যবস্থা আছে | আমাদের দলটিতে শিশুসহ ২৮ জন সদস্য ছিল | বেশ কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় এই অনবদ্য মিলনমেলার আয়োজন করে তারা |

এই রিট্রিটের পেছনদিকে পাহাড়গুলোর ঠিক মুখোমুখি ৩০ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে একটি দ্বীপ | দ্বীপে যাওয়ার জন্য রয়েছে ফুটব্রিজ | দ্বীপে যাওয়া-আসায় ফুটব্রিজটা ব্যবহার

করেছি আমরা | একটু অসুবিধা বোধ হলেও ফুটব্রিজের উপর দিয়ে হেঁটে দ্বীপে যেতে খুবই মজা লেগেছে, বিশেষ করে

সেখানে গিয়ে মুরগি, মোরগ, আলপাকা, বাঙ্কা এবং কারমেলিটাগুলো দেখে বেশ ভাল লাগছিল | ফুটব্রিজ পেরিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, দ্বীপে হাঁটা আর খাঁড়ির জলের দিকে পাহাড়ের তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া খুবই উপভোগ্য ছিল |

এই রিট্রিটের কাছাকাছি দুটি পর্বতমালা আছে – একটি ১৫ মিনিট ড্রাইভের মধ্যে, নাম বেলেয়ার মাউন্টেন; আর অন্যটি হান্টার মাউন্টেন, যা প্রায় ২৫ মিনিটের ড্রাইভ।

কাজিন গ্রুপ আরও একটা ভাল ব্যবস্থা করেছিল, তা হ'ল – বেশিরভাগ খাবার কেটারিং করা, যার ফলে আমাদের রান্নাবান্নার চিন্তা করতে হয়নি। এসবের দায়িত্বে যারা ছিল, তারা নিজেরাই ড্রাইভ করে কপারহুড রিট্রিটে খাবার দিয়ে গেছে। যার ফলে আমরা নিউ জার্সি আর বস্টনের সুপরিচিত হোম ডেলিভারি রান্না ভালমতো উপভোগ করেছি। রিট্রিটে একটি বাণিজ্যিক আকারের রান্নাঘর ছিল। খাবার সংরক্ষণের জন্য বিশাল রেফ্রিজারেটর থাকায় কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। সঙ্গে ছিল বেশ কয়েকটা চা কফির স্টেশন। সেখানে নানা দেশের হরেক রকম চা কফির প্যাকেট রাখা; খুশিমতো আমরা সেসব ব্যবহার করেছি।

এই পুরো বাসস্থানটি জুড়ে ছিল একটি কাঠের বারান্দা/টেরাস, যেখানে রাখা আছে চেয়ার, টেবিল আর ছাতা।

সেখানে আরাম করে শুয়ে বসে, নির্মল পাহাড়ি বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে আনন্দ উপভোগ করেছি আমরা সবাই। রিট্রিটে ছিল খোলা আকাশের নীচে একটি পেশাদার ক্যাম্পফায়ারের ব্যবস্থা। একদিন সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত সেই বিশাল অগ্নিকুন্ডের

চারপাশে সবাই মিলে খাবারদাবার নিয়ে বসে, আমরা দুর্দান্ত এক সময় কাটিয়েছি।

আমাদের দলে ছিল চারজন জামাই, যারা বয়স্কদের দেখাশোনা করার জন্য সদা সচেতন ছিল। পুরো গ্রুপে আমিই সবচেয়ে বয়স্ক হওয়ার কারণে সর্বাধিক পরিচর্যা আর যত্ন আমার কপালেই জুটেছিল। সবসময় হাই বাবা, মেজমামু, ভাইদা, আর ডাকনামের ভিত্তিতে বুড়োদা, বুড়োজ্যেঠু, বুড়োমামু ডাকে আমাদের পরের প্রজন্ম আমার সবরকম প্রয়োজনের খবরাখবর নিয়েছে। এই দলে এমন কেউ ছিল না যে আমাকে 'মৃণাল' বা 'মৃণালদা' বলে সম্বোধন করে; ওই পোশাকী নামটা আত্মীয়তার বাইরে, বন্ধু সম্পর্কের জন্য।

এমনি করেই ক'টা দিন প্রচন্ড হৈ হৈ করে আর প্রাণভরা আনন্দে কেটে গেল। কপারহুড রিট্রিট একটি পুরস্কার

বিজয়ী বুটিক গন্তব্য স্থান, যেখানে সুস্থতা এবং শান্তির একটি নিখুঁত পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে। বাড়ি ফিরেও সেখানের স্মৃতি আমাদের মনে ভাল লাগার অনুভূতিতে ছেয়ে রেখেছে।

অথ ট্রেনঘটিত

হৈমন্তী ভট্টাচার্য

বাস ও ট্রেনের মধ্যে কোনটাতে গেলে তুলনায় আরাম করে যাওয়া যায়? এরকম একটা প্রশ্ন করলে আরো বেশ কিছু প্রশ্ন আপনারা করবেন, সেটা জানি। যথা – কতদূর যাওয়া? কোন সময়ে? অফিস টাইমে না এমনি অন্য কোনো সময়ে? তবে দূরপাল্লায় যেতে হলে ট্রেনই সড়ক যাত্রার তুলনায় আরামদায়ক বিকল্প, এতে সন্দেহ নেই। ট্র্যাফিক জ্যাম নেই, ঝাঁকুনি নেই। আর কাছাকাছি যেতে? এই ধরুন শিয়ালদা থেকে বেলঘরিয়া? বা বারাসাত থেকে দত্তপুকুর? সেখানে কিন্তু পাঠকদল দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে। কারোর ট্রেনে সুবিধা, তো কারোর বাসে।
যাইহোক, মাঝখানে দাগ টেনে একদিকে বাস আরেক দিকে ট্রেন লিখে সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা আরেক দিনের জন্য তোলা থাক।

যে জন্য এরকম একটা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভূমিকা করলাম, গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে সেটা বলি। ব্রিফ অ্যান্ড টু দি পয়েন্টে সেটা হ'ল একটি ট্রেনঘটিত বিপদ। ভুক্তভোগী স্বয়ং আমি।

সময়টা ঠিক পুজোর আগে। বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। তখন আমি সল্টলেকে একটা বি.এড কলেজে সরকার বাহাদুরের ব্যবস্থাপনায় কিভাবে আরো ধারালো চোখা শিক্ষক হওয়া যায় তার প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলাম। পুজোর পরই পরীক্ষা। আর ফাঁকিবাজ ছাত্রছাত্রী মাত্রই জানেন যে সাতজন্মে কলেজে না গেলে, আর পড়াশোনার সাথে মুখ দেখাদেখি না থাকলে, পরীক্ষার ঠিক আগে যে পরিমাণ পড়াশোনা জমে যায়, তা পে-কমিশন না পাওয়া সরকারী কর্মীদের জমে থাকা ক্ষোভের চেয়ে মোটেই কম নয়।

তা সে যাক, দেখা গেল দিস্তা দিস্তা নোটস জেরক্স করার আছে। বন্ধুদের দলের একটু বোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিল, শিয়ালদায় গেলে এত জেরক্সে কিছু টাকা কম লাগবে। চল, শিয়ালদা। আমিও দলে পড়ে চুপচাপ সকলের পিছু পিছু বাসে শিয়ালদা চলে গেলাম। গাদাখানেক জেরক্সের পোঁটলা নিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, সব্বোনাশ! সাড়ে সাতটা! বাড়িতে আমার দুগ্ধপোষ্য কন্যা, বেচারি নির্ঘাৎ আমার জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে এতক্ষণে।
দুদ্দাড় করে বাসস্ট্যান্ডের দিকে ছুট লাগাব, এমন সময়ে একজন বলে বসল, "দূর বোকা, যাবি তো দমদম। বাসে কেন? ট্রেনে চলে যা, সময় কম লাগবে।"
তাইতো! কিন্তু ট্রেনে চলাফেরার অভ্যেস নেই যে! দমদমবাসী আরেক বন্ধু, ইন্দ্রাণী সাথী হয়ে সাহস জোগাল, "আরে চল না, দুজন আছি তো।"

কী কুক্ষণে যে সেদিন সময় বাঁচাতে ট্রেনে গেলুম! বলছি সে অভিজ্ঞতা। বিশাল অ্যানাকোন্ডার মতো লাইন পার করে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে দেখি অফিসফেরতা জনগণের থিকথিকে ভিড়ে পা ফেলা দায়। একদম জনসমুদ্র। ট্রেন এসে একরাশ করে ভিড় উগরে দিচ্ছে, আবার পেট ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। বলা ভাল, লোকে নামবার আগেই ঝপাঝপ লোক উঠে যাচ্ছে। এরকমভাবে ট্রেনে ওঠা আমাদের কম্মো নয়; ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইলাম।

দুজনে করুণমুখে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যেতে লাগলাম – এক, দুই, তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে ভেতরের দিকের প্ল্যাটফর্মগুলোতে। হুঁ হুঁ, আমরা হলুম হাতিবাগান, গড়িয়াহাটে ঘুরে একই ওড়না দশ জায়গায় দরদস্তুর করে পাঁচটাকা কমে কেনা পাবলিক! ট্রেনে ওঠাতেও সেই থিওরিই কাজে লাগাব। বললে বিশ্বাস করবেন না, সে সূত্র কাজেও এল। একটা ফাঁকা হালকা হলুদ-ঘন সবুজ লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে একগাদা এক্সপ্রেস ট্রেনের মাঝে। সামনে গিয়ে দেখি অল্প কয়েকজন মাত্র বসে আছে তাতে। দুজনে লাফ দিয়ে একটা কামরায় উঠে ভুরভুর করে ঘুরে চলা পাখার নীচে, জানলার ধারে বসে পড়লাম। কী আনন্দ! যে পরে যায় সে সোনা পায়!
আমরা উঠতেই ট্রেন দুলকি চালে চলতে শুরু করল। হঠাৎ দেখি প্ল্যাটফর্ম থেকে কয়েকজন চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। আর ট্রেনে থাকা কয়েকজন যুবক, এবং কয়েকজন যুবতীও, "নামুন, এটা কারশেড ট্রেন" বলে ঝপাঝপ লাফিয়ে নেমে গেল। কিন্তু গতিশীল ট্রেন থেকে নেমে সমগতিতে দৌড়োতে না পেরে দুজন যেরকম ধপাস ধপাস করে আছড়ে পড়ল, তা দেখে আমাদের বুক শুকিয়ে গেল। এভাবে লাফালে হাত, পা, মাথা সবকটাই একসঙ্গে ভেঙে এখানেই জীবন সাঙ্গ হতে পারে

ভেবে আমরা ট্রেনেই রয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে ট্রেনের বাঙ্কের নীচের রুপোলি চেনটা প্রাণপনে টানতে লাগলাম; ভুল হ'ল, টানার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু হয় সেটা খারাপ, আর না হলে কারশেড ট্রেনে চেন টেনে কাজ হয় না। ট্রেনটা অবাধ্য বুনো ঘোড়ার মতো স্পিড নিল। প্ল্যাটফর্মকে পেছনে ফেলে গতি বাড়িয়ে অন্ধকারে পাড়ি দিল।

এক মিনিটকে এক ঘন্টা মনে হওয়া কাকে বলে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে বিস্তর বন জঙ্গল পার করে নারকেলডাঙা কারশেডে গিয়ে ট্রেনবাবাজি 'ঘটাং ঘট' আওয়াজ তুলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগনিদ্রায় গেলেন।

অতঃপর? ট্রেনের পাটাতন থেকে মাটি প্রায় তিন ফুট নীচে। লাফ দিয়ে নামতে গেলে মুখ থুবড়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। ইন্দ্রাণী বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, "শোন, আমরা ট্রেনেই বসে থাকি, এই ট্রেনই ঘুরে শিয়ালদা যাবে।"

- "কিন্তু যদি সেটা পরের দিন হয়! সারারাত ট্রেনে থাকব! ওরে বাবারে; নাহ!"

শেষে আমরা নামবারই চেষ্টা করলাম। অতি কসরৎ করে লাফ মেরে কাদাজলে গোড়ালি ডুবিয়ে মাটিতে পা রাখলাম।

সারি সারি ট্রেন পরপর দাঁড়িয়ে আছে। রূপকথার 'হাতিশাল' 'ঘোড়াশাল'-এর মতো এটাকে 'ট্রেনশাল' বলাই যায়।

ট্রেনে উঠেছিলাম শিয়ালদার দিকের প্রথম কামরায়, ফলত কারশেডের ল্যাজার দিকে হ'ল সেটা। নেমে কোনো লোকজন দেখতে পেলাম না। ড্রাইভার হয়তো আগেই নেমে গেছে। এবার আমাদের সামনে যে এক এবং একমাত্র উপায়টা খোলা সেটা হ'ল হেঁটে হেঁটে শিয়ালদা স্টেশনে ফেরা।

রেল ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মোবাইল বের করে দেখি চার্জ শেষের পথে। প্রথমেই কত্তাকে ফোন করলাম। সব জেনে বাছা বাছা খিস্তি সহযোগে তার কাছ থেকে শুনতে হ'ল, "কী উজবুক রে বাবা! বোর্ড দেখে ওঠোনি? মাথায় কি গোবরের ফ্যাক্টরি?"... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। দূরে রেলের খুঁটিতে নানা রঙের আলো। জালের মতো একটা লাইনের সঙ্গে আরেকটা লাইন শাখা প্রশাখা বিস্তার করে জুড়ে আছে। তার ওপর রেলের খুঁটির নানা রঙের আলো পড়ে একটা সর্পিল লাইনাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ পেছনে একটা জোরালো আলো; ফিরে দেখি ট্রেনের হেড-লাইটটা বেশ কাছেই। কিন্তু কোন লাইনে ট্রেন আসছে ঠাহর করা যাচ্ছে না। ট্রেনটা কিন্তু এগিয়ে আসছে না। আলোটাও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। আমরা আন্দাজে বুঝলাম ট্রেনটা হয়তো সিগনাল পায়নি বলে শিয়ালদায় ঢোকার আগে দাঁড়িয়ে গেছে।

- "কী করা যায় বল তো ইন্দ্রাণী? ট্রেনটা যাওয়া অবধি দাঁড়াব?"

- "অপেক্ষা করবি? তারপর তো আবার একটা ট্রেন আসবে! কতক্ষণ দাঁড়াবি?"

ইন্দ্রাণীর বুদ্ধিটাই ঠিক মনে হ'ল।

আবার আমরা প্রায় ছুটতে শুরু করলাম। আরেকটু এগিয়ে দেখি ও হরি! নীচে খাল, তার পাশে সরু রাস্তা। তার ওপর ঝুলন্ত রেল সেতু। স্লিপারের কাঠগুলোর ফাঁক দিয়ে নীচের খালের কালো জল দেখা যাচ্ছে। যদি পার হবার সময় ট্রেন এসে যায়, তাহলে লাফ দিলে সোজা খালে ডুবে যাব!

যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ছোট্ট ছানাটা খাটের উপর হাতপা ছুঁড়ে খেলা করছিল। প্রত্যেকদিন যখন বাড়ি ফিরি, কিছু না বুঝেই ফোকলা মুখে একগাল হেসে আমার অভ্যর্থনা করে। এখন কী করছে ও? ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। আমি এখানে ট্রেনে কাটা পড়ে বা খালে ডুবে মরে গেলে আর তো দেখা হবে না। লাল লাল পা, নরম কচি কচি হাত, আর পিটপিটে চোখ নিয়ে যখন আমায় খুঁজবে, তখন ওকে সামলাতে পারবে তো ওর বাবা? ভাল থাকিস সোনা, বাবা দিদা ঠাম্মাকে বেশি জ্বালাতন করিস না কিন্তু। চোখটা একটু জ্বালা করে উঠল।

একটা একটা করে স্লিপার পার হচ্ছি। যেন একটা করে নতুন জন্ম হচ্ছে। জীবন-মৃত্যুর মাঝে একটা সরু সুতোয় টিমটিম করে দুটো প্রাণ কাঁপতে কাঁপতে নিজেদের জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। যে কোনো মুহূর্তে নিয়তির মতো ট্রেনটা এসে আমাদের বাঁচার লড়াই শেষ করে দিতে পারে। তখনও চারটে স্লিপার বাকি এমন অবস্থায় হঠাৎ গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটা হুংকার দিয়ে উঠল, যেন বলে উঠল, "সাবধান, সরে যাও!" পা দুটো থরথর করে কাঁপছে বুঝতে পারছি, কুলকুল করে ঘাম ঝরছে। ট্রেনের আওয়াজ ক্রমশ কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে সাহস হ'ল না। "মা গো" বলে দুজনে হাত ধরাধরি করে লাফিয়ে লাফিয়ে চারটে স্লিপার যে কীভাবে পার হলাম সে ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম।

খাল পেরিয়ে লাফিয়ে খোয়ার ওপর গিয়ে পড়লাম দুজনে। ট্রেনটা পাশ দিয়ে হুহু করে বেরিয়ে গেল। ছোটবেলার মতো "রেডি স্টেডি গো" বলে আবার ছুটতে শুরু করলাম আমরা।

ছুট... ছুট... ছুট...

ওই... ও-ওই তো প্ল্যাটফর্ম!

মাইল মাইল সাঁতার কেটে জাহাজ ডোবা ডুবন্ত মানুষ যখন পাড় দেখতে পায় এরকমই আনন্দ হয় কী! প্ল্যাটফর্মের ঢাল দিয়ে ওপরে উঠে দুজনে দুজনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম।

এরপর দুজনের ফোনেই দুটো ফোন এল। আমার তিনি এবং ইন্দ্রাণীর দাদা স্টেশনে উপস্থিত। আমরা স্বীয় গার্জেন সমভিব্যাহারে স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করলুম।

তারপর আমাদের বাড়ির লোকেরা আমাদের কী গতি করল সেটা আর এক গল্প।

***

বি.এডের পাঠ চুকিয়ে আমরা আমাদের কর্মস্থলে যোগ দিয়েছি। কালীপুজোর প্রদীপ কিনতে হাতিবাগান মার্কেটে গেছি; হঠাৎ একমাথা সিঁদুরপরা এক নতুন বউ পেছন থেকে জাপটে ধরেছে।

- "কে রে? আরে ইন্দ্রাণী!"

এ কথা সে কথা, হাঁড়ি-হেঁসেলের গপ্পো করতে করতে হঠাৎ দুজনের মনেই সেই পাঁচ বছর আগের ভয়াবহ স্মৃতি ভেসে উঠল। ইন্দ্রাণী বলে উঠল, "কী রে মনে আছে সেই...!"

আমিও রসগোল্লার মতো চোখ করে বললুম, "বাব্বা, মনে থাকবে না... সে-ই যা ঘটনা!"

আমার কত্তাটি জানেন, তিনি মিটিমিটি হাসছেন। ইন্দ্রাণীর বর কিছুই জানেন না। তাঁর জিজ্ঞাসু মুখের দিকে শ্যালিকাসুলভ কটাক্ষ হেনে মুচকি হেসে বললুম, "সে এক কাণ্ড! শুনবেন বাড়ি গিয়ে আপনার গিন্নির কাছে!"

আমার কত্তা গম্ভীরমুখে টিপ্পুনি কাটলেন, "ভাগ্যিস বিয়ের আগে জানেননি!"

ভদ্রলোকের হতভম্ব গোল গোল চোখ দেখে আমরা দুই বন্ধুই হাসিতে ফেটে পড়লাম।

এক পশলা বৃষ্টি

সুজাতা দাস

- "আরে! তুমি নন্দিতা না?"

আচমকা একটা হাত নন্দিতার কাঁধ ছুঁয়ে থাকায় নন্দিতা চমকে ঘুরে তাকাল। দেখল ছেলেটি অবাক হয়ে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে নন্দিতার মুখের দিকে। নন্দিতাও কম অবাক নয় এই মুহূর্তে, বিস্মিতও কম হয়নি। আর সেইটা বুঝতে পেরেই তড়িঘড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে ছেলেটি বলে উঠল, "না, মানে মাপ করবেন। আসলে, আমার বোধহয় ভুলই হ'ল। কিছু মনে করবেন না ম্যাম, মানে আমি না বুঝেই... সরি, সরি ম্যাম।"

ছেলেটির কথা শুনতে শুনতে নন্দিতার কেমন যেন চেনা মনে হতে লাগল ছেলেটিকে। কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না কিছুতেই; কিন্তু মন বলছে ছেলেটিকে সে চেনে। তার এই হাবভাব অনেক আগে থেকেই চেনে নন্দিতা।

রহস্যময় একটা হাসি নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে নন্দিতা বলে উঠল, "ইটস্ ওকে।"

ঠিক এই সময় হঠাৎই তার মনে এল কুশলের কথা। কোথায় যে হারিয়ে গেল কুশল, নন্দিতা নিজেও জানে না। কথা দিয়ে কেউ রাখে না, মিছিমিছি কষ্ট দিতে কথা দেয় সবাই – একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের গন্তব্যের দিকে হাঁটতে লাগল নন্দিতা।

হাঁটতে হাঁটতেই একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে "ওরে বাপরে!" বলে চেঁচিয়ে উঠল সে। অনেক দেরী হয়ে গেছে আজও। বাড়িতে গিয়ে আবার বকা খেতে হবে মায়ের কাছে।

কিন্তু হঠাৎ অনুভব করল একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর মনে হতেই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ছেলেটি সেই একই জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে। অবাক লাগল ছেলেটির আচরণে। ফিরে চলল আবার আগের জায়গায়, যেখানে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে যেতে যেতে নন্দিতার হঠাৎই মনে হ'ল ছেলেটি তার নাম জানল কীভাবে! কোথায় তাকে দেখেছে মনে করতে পারল না সেই মুহূর্তে। তবে মনের দ্বন্দ্ব মেটাতে সে ছেলেটির সামনে এসে বলল, "এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, না বাড়ি যাবেন?"

নন্দিতার আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠল ছেলেটি। তারপর বিভ্রান্ত হয়ে বলল, "বাড়ি! ও হ্যাঁ, যেতে হবে বাড়ি..."

- "তবে আর দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটুন; রাত হয়ে যাচ্ছে মেঘও করেছে ভীষণ, যখন তখন বৃষ্টি আসতে পারে।"

বলতে বলতেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা এসে পড়তে থাকল দুজনের গায়ে মাথায়। হঠাৎ ছেলেটির হাত ধরে ছুটতে থাকল নন্দিতা বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য। পেয়েও গেল একটা গাড়ি বারান্দা, যেখানে আগে হয়তো গাড়ি থাকত তবে এখন শুধু ওপরের ছাদটাই আছে। এইটুকু ছুটে এসেই ছেলেটি প্রচন্ড হাঁপাতে লাগল বুকে হাত দিয়ে। প্রথমে গায়ে মাথার জল ঝাড়তে ব্যস্ত থাকলেও ছেলেটির দিকে চোখ পড়তে নন্দিতা বলে উঠল, "কী হয়েছে আপনার?"

ছেলেটি বলল, "না, তেমন কিছুই নয়, ছুটে এসে কেমন যেন বুকে হাঁপ ধরে গেল।"

- "এইটুকু ছুটে এসেই!" বলল বিস্মিত নন্দিতা।

বৃষ্টি কমলে বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল নন্দিতার; তবে মায়ের বকুনির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল এই বৃষ্টি। মনে মনে ভাবল এমন বৃষ্টি মাঝে মধ্যে হলে অনেক কিছুই লুকোনো যেতে পারে। হঠাৎ মনে এল, ঐ যাঃ, ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করা হ'ল না তো! এতক্ষণ একসাথে রইল অথচ...। কেন যেন মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল ছেলেটিকে সে চেনে; মানে, খুব ভালমতো চেনে। ঠিক যেন হারিয়ে যাওয়া কুশলের মতো। এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল এসে গেল। কোথায় চলে গেল কুশল তাকে না বলে!

ভাবনার মাঝেই মায়ের ডাক কানে এল। সম্বিৎ ফিরতে চোখের জল মুছে দরজা খুলে দেখল মা এককাপ চা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে।

- "কিছু বলবে মা?" জিজ্ঞেস করল নন্দিতা।

- "এটা খা আগে, নাহলে ঠান্ডা লেগে যাবে।" বলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, "কী হয়েছে রে খুকু, কাঁদছিস কেন?"

নন্দিতা চমকে তাকাল মায়ের দিকে; তারপর বলল, "মা, কারো স্বভাব অন্য আরেকজন মানুষের মতো হয় কখনও?"

মেয়ের মাথাটা বুকের কাছে টেনে এনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, "হয় রে। তবে পুরোটাই আমার শোনা কথা। পৃথিবীর দুটো মানুষের চলাফেরা হাবভাব হুবহু একরকম; অথচ তারা সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, আলাদা মা বাবার ঘরে তাদের জন্ম।" বলে জিজ্ঞাসু চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন?

কোনও কিছু না লুকিয়ে সন্ধ্যে থেকে ঘটে যাওয়া সব কথা মাকে বলল নন্দিতা। শুনতে শুনতে অবাক হয়ে শর্মিষ্ঠাদেবী তাকিয়ে দেখছিলেন মেয়ের মুখের দিকে।

কথা শেষ করে নন্দিতা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "মা, আমি যে কুশলকে খুব ভালবাসি। তবে ও কেন আমাকে না বলে হারিয়ে গেল?"

মেয়ের কান্না দেখে শর্মিষ্ঠারও চোখে জল এসে গেল। আলগোছে নিজের চোখের জল মুছে একটু হেসে বললেন, "খুকু, এই ছেলেটির নাম কীরে?"

মায়ের বুকের ওপর থেকে মাথা তুলে নন্দিতা বলল, "জিজ্ঞাসা করিনি মা।"

- "বলিস কী! এতক্ষণ একসাথে রইলি, আর নাম জিজ্ঞাসা করিসনি? তবে একটা ব্যাপারে আমি অবাক হচ্ছি, ও তোর নাম জানল কী করে? একজন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ তোর নাম জানবে কীভাবে!" বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শর্মিষ্ঠাদেবী। আবার বললেন, "একটু বিশ্রাম নিয়ে খেতে আয়; বাবা বসে আছেন।"

রাতের খাওয়া শেষ করে দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এল নন্দিতা। আগে নন্দিতার বাবা-মা উপরেই থাকতেন। কিন্তু আজকাল কমলেশবাবুর সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয় বলে মাস দুয়েক হ'ল নীচের ঘরেই থাকতে শুরু করেছেন। সেই কারণে শর্মিষ্ঠাদেবীও নীচেই থাকেন স্বামীর সঙ্গে। এখনও কয়েক বছর চাকরি আছে কমলেশবাবুর। নির্ঝঞ্ঝাট ছোট্ট পরিবার তাঁদের। নন্দিতা তাঁদের গর্ব। যেমন লেখাপড়ায়, তেমন সব কিছুতেই সে ভাল এবং একটা ভাল স্কুলে চাকরিও করে।

ইদানীং একটু নিজের মতোই থাকে নন্দিতা। মেয়ে বড় হচ্ছে তাই তাকে নিজের মতো থাকতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, এটাই ভাবেন কমলেশবাবু।

তবে আজ খাবার টেবিলে মেয়ের বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়াটা তাঁকে একটু হলেও, চিন্তায় ফেলেছে।

অনেকদিন পরে পূবের জানালাটা আজ আবার খুলল নন্দিতা। অনেক দূরের শুক্রগ্রহটা যেন এক ঝলক হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইল। কুশলের বলা একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল নন্দিতার – "যদি কখনও আমি হারিয়ে যাই অলি, তবে খুঁজে দেখো, শুকতারায় পাবে আমাকে..." প্রায়ই বলত কুশল।

হঠাৎ দুই ভুরু কুঁচকে উঠল নন্দিতার, তবে কী কুশল জানত ও হারিয়ে যেতে পারে নন্দিতার জীবন থেকে! কিন্তু কীভাবে? সেও কী সম্ভব? কেউ কি আগে থেকে জানতে পারে!

অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে খাটে এসে বসল নন্দিতা। এতটা সময় একসাথে কাটাবার পরেও কেন ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করার কথা মনে এল না তার! নিজেও খানিক অবাক হ'ল এই ভেবে যে কেন ছেলেটির সবকিছু কুশলের মতো মনে হচ্ছে তার! কেন হারিয়ে গেল কুশল? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল নন্দিতা। সে তো কারো কখনও ক্ষতি করেনি। সেদিনই প্রথম তাদের বাড়িতে আসার কথা ছিল কুশলের। কিন্তু কেন এল না, আর কোথায়ই বা গেল আজও সেটা বুঝে উঠতে পারেনি নন্দিতা। এত ভাল বন্ধু ছিল যে কখনও তার বাড়ি কোথায় সে কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। আসলে মা বাবার সঙ্গে কুশলের সাক্ষাৎ না করিয়ে এর বেশি এগোতে চায়নি নন্দিতা। কিন্তু কুশল তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পেরেছে কুশলকে ছেড়ে তার পক্ষে বাঁচা মুশকিল। মাকে সবই বলত নন্দিতা, কখনও কিছু লুকিয়ে রাখেনি। কেমন করে একদিন তাদের আলাপ হয়েছিল সে কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায় নন্দিতার। সেদিনও হঠাৎ করেই এমন বৃষ্টি নেমেছিল কলেজ থেকে ফেরার পথে। সবে ব্যাগ থেকে বার করে ছাতাটা খুলতে যাবে, হঠাৎ একটা ছেলে এসে আধখোলা ছাতার তলায় ঢুকে পড়ে দুই হাতে ছাতাটা সোজা করে ধরল।

- "আরে আরে, কী করছেন আপনি? আমার হাত থেকে আমারই ছাতা নিয়ে আপনি মাথা ঢাকা দিয়েছেন আর আমি বাইরে?" বলেছিল নন্দিতা।

- "ও সরি, সরি ম্যাম, আসুন আমার ছাতার নীচে, হয়ে যাবে দুজনেরই।"

নন্দিতা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ছেলেটির মুখের দিকে।

সেদিন কুশলের চোখে মুখে একটা সরলতা দেখতে পেয়েছিল নন্দিতা। যদিও নামটা অনেক পরে জেনেছিল; প্রায় একমাস পরে, যখন সে ছাতাটা ফিরিয়ে দিতে এসেছিল।

কেমন করে যেন ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল। তারপর সেই বন্ধুত্ব অন্য রূপ নিতে থাকল। নন্দিতা অনুভব করছিল মনের গভীরে একটা জায়গা করে নিয়েছে কুশল।

যেদিন কুশল চাকরিতে জয়েন করল সেদিনই সে নন্দিতাদের বাড়িতে আসবে ঠিক হ'ল। মাকে সব জানিয়েছিল নন্দিতা; সারাদিন ধরে নানারকম রান্না করলেন শর্মিষ্ঠাদেবী। কিন্তু কুশল এল না। গোছানো ঘর আর রান্না পড়ে রইল। নন্দিতার প্রতীক্ষা চোখের জলে শেষ হ'ল।

সব ক্ষত একদিন শুকিয়ে যায়, নন্দিতার ক্ষতও শুকিয়ে গেল। নিজের জীবন নতুন করে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল নন্দিতা – একটা স্কুলে চাকরি করে এখন সে। নিজেকে কাজের মধ্যে এতখানি জড়িয়ে ফেলল যাতে কুশলের কথা আর মনে না আসে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনের ভেতরের ক্ষতটা কুশলের কথা ভীষণভাবে মনে করিয়ে দেয়। হারিয়ে ফেলে তখন নিজেকে এক সমুদ্র জলের মাঝে।

ভুলতেই বসেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় আবার দেখা হয়ে গেল সেই ছেলেটির সাথে। নিজের নামটা অন্যের মুখে শুনে চমকে উঠল নন্দিতা। ঘুরে তাকাতেই দেখল সেই ছেলেটি।

ছেলেটিই বলল, "ভুলে গেছেন আমাকে? আমি কিন্তু আজও মনে রেখেছি আপনাকে।"

কথাটা শুনে নন্দিতা ভাল করে তাকাল ছেলেটির দিকে।

- "যদি একটু সময় হয় আমরা কোনও কফি শপে গিয়ে বসতে পারি।" নন্দিতাকে বলল ছেলেটি।

ছেলেটির মুখে 'নন্দিতা' নামটা বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছিল কুশলের কথা। কোনও উত্তর না দিয়ে ব্যাগ থেকে মোবাইল বার করে মাকে জানিয়ে দিল বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। তারপর ছেলেটির সাথে এগিয়ে গেল সে।

দু'কাপ কফির দু'পাশে দুটো হাত আলগোছে পড়ে আছে, হঠাৎ একটি হাত উঠে এল আরেকটি হাতের পাতার উপরে।

- "সত্যিই কি একটুও চেনা লাগছে না আমাকে, অলি?"

চমকে তাকিয়ে রইল নন্দিতা; আর মুখ থেকে বেরিয়ে এল "কুশল!"

- "হ্যাঁ, ফিরে এলাম নতুন রূপে তোমার কাছে।"

নন্দিতা দেখতেই থাকল অচেনা চেহারার ছেলেটির দিকে, ঠিক যেন কুশলের মতো।

- "খুব অবাক হচ্ছ তো অলি?" বলল কুশল।

- "সেদিন আমি খুব আনন্দে ছিলাম জানো! নতুন চাকরিতে জয়েন করা আর তোমাকে পাওয়ার এক অদ্ভুত অনুভূতি... দুটো মিলিয়ে কেমন যেন এক দিশাহারা অবস্থা তখন আমার।

বসকে বলে সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে। উবার বুক করে অপেক্ষা করছিলাম। তখন তুমি ফোন করলে এত দেরী করছি বলে। তোমার সঙ্গে কথা শেষে ফোন রাখতে যাব, হঠাৎ দেখলাম একটা লরি বেপরোয়াভাবে ছুটে আসছে দুটি স্কুলের ছেলেমেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, সেদিকে। ছুটে গেলাম বাচ্চাদুটিকে সরিয়ে দেবার জন্য। আমার ধাক্কাতে দুজনেই ছিটকে পড়ল ফুটপাথের কাছে। কিন্তু আমি সময়মতো সরতে পারলাম না। মুখের একটা পাশ ঘেঁষে চলে গেল লরিটা। শুধু দেখতে পেলাম তোমার জন্য নেওয়া ফুলগুলো রক্তে রাঙা হয়ে উঠছে। এর পর যখন জ্ঞান ফিরল, একটা নতুন চেহারায় দেখতে পেলাম নিজেকে। তখন প্রায় দু'বছর হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে।

পথের লোকজন সেদিন ধরাধরি করে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল আমাকে। পকেটে রাখা আমার ডায়েরিতে আমাকে মানুষ করা ফাদারের ফোন নম্বর পেয়ে তাঁকেই ফোন করেছিল লালবাজার থানা থেকে। ছোটবেলায় বাবা মা হারানো একটা ছেলেকে বড় করে তুলেছিলেন চার্চের ওই ফাদার। আমি অনাথ ছিলাম। শুনেছিলাম অ্যাক্সিডেন্টে আমার মা বাবা আর আমার জমজ ভাই একসাথে মারা গিয়েছিল।

সেদিনের অ্যাক্সিডেন্টে আমার ফোনটা একদম চুরচুর হয়ে গিয়েছিল, তাই তোমার হদিশ পায়নি ওরা।

দু'বছর কোথায় ছিলাম, কীভাবে এই অবস্থায় ফিরলাম আমি জানি না। আমি জীবন্মৃত অবস্থাতেও তোমাকেই খুঁজেছি, এটা ফাদারের কাছেই শোনা।

তোমাকে খুঁজেছি অনেক। ফাদারের কাছে শুনে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেখানেও খোঁজ করেছি।

হঠাৎ সেদিন তোমাকে দেখলাম। চিনতেও পারলাম, তাই ছুটে গিয়ে তোমাকে ছুঁয়েছিলাম। আর ঠিক তখনই আমার সবকিছু মনে পড়ল অলি, সবকিছুই।

তুমি পারবে অলি, এই নতুন চেহারায় আমাকে ভালবাসতে?" ধরে থাকা হাতের উপরে নিজের আর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল কুশল।

নন্দিতা স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল, আর অঝোরে কাঁদছিল। খুশিতে ভরে উঠছিল তার মন – কুশল তার কাছেই আছে ভাবনায়।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নন্দিতা। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিল কুশলের দিকে, কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর নয়। এখনই তার মা বাবার কাছে নিয়ে যাবে কুশলকে।

দুজনে যখন রাস্তায় নামল হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি ভিজিয়ে দিল দুজনকে, আর দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একই অনুভূতিতে ভেসে গেল।

আগমনীর সুরে

কমলপ্রিয়া রায়

শরতের শিশিরে শিশিরে
আগমনীর সুরে সুরে
শিউলিফুলের সুবাসে
প্রাণ ভরে পবিত্র আবেশে
মাগো তুমি যে আসছ
পরশ পাই এই ধরণীতে
এই শরতের আকাশে
এই প্রফুল্ল বাতাসে
মোদের মন হয় সোনার রঙে স্বর্ণিল
আজ জগৎ হয় রঙ-বেরঙে বর্ণিল
তুমি আসবে বলে ধরিত্রী আজ সাজল
তুমি আসবে বলে জগৎ খুশীতে ভাসল
তোমায় বরণ করব বলে এনেছি এই ডালা
তোমায় পরাব আজ স্থলপদ্মের মালা
তোমার আশিস নিয়ে চলব মোরা সব কাজে
তোমার আগমনী সুর মোদের মনে সদাই যেন বাজে।

মনসঙ্গীত

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

তাদের দোঁহে চলার জীবন নির্ধারিলে প্রভু,
প্রেম, প্রীতি আর সেবার মনন অভাব না হয় কভু।

নিত্যদিনের কাজের মাঝে সদাই তোমার আশিস রাজে,
বাধার পাহাড় পার হয় যেন দৃপ্ত চিতে প্রভু।
প্রেম, প্রীতি আর সেবার মনন অভাব না হয় কভু।

সুখের দিনে চিত্ত যেন নিত্য থাকে শান্ত,
দুখের সময় তাদের তুমি রেখো হে অক্লান্ত।

সুস্থ সবল দেহ-মনে শতেক বছর চলুক দোঁহে,
তোমার পানে প্রাণ মিশে থাক বিস্মৃত নয় কভু।
প্রেম, প্রীতি আর সেবার মনন নিত্য দিও প্রভু।

ভুল করে ভুল করেও যদি ক্ষমিও তাদের তবু,
সরল মনে পবিত্র মান সদাই দিও প্রভু।
প্রেম, প্রীতি আর সেবার মনন অভাব না হয় কভু।

সমাপ্তি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

কিছু কবিতা শুরু হয়
শেষ হয় না...
কিছু কথা বুকের মধ্যে জেগে ওঠে
কেঁপে ওঠে বসন্তের হিল্লোলে সদ্য-ফোটা ফুলের মতো
তাদের ধরে বেঁধে খাতার পাতায়
সাজানো যায় না।

মাঘ-সন্ধ্যার জোনাকির মতো, কিছু উজ্জ্বল
আঁধার-লোভী সাধ, কেঁপে কেঁপে
উড়ে যায় মনের প্রান্তরে
তাদেরও ধরে বসানো যায় না;
অনন্তের ঘরে থিতু করে, করা যায় না চুরি
অলীক-আলোক মালা

আলোর সাধ, শব্দসুধারস নিকিয়ে
জীবনকে ছুঁয়ে থাকা অটুট বিশ্বাস –
ফুরিয়ে আসে ধমনীর
ক্লান্ত গতিস্রোতে

ভালবাসা মরীচিকার মতো
ক্রমশ দূরে, আরও দূরে, আরও আরও দূরে
ভেসে যায়, নদীজলে সোনালি খড়ের মতো...
তাকে ঠোঁটে তুলে বাসা বাঁধা হয় না আর
কবিতা, নীড়, মন, একে একে
থেমে যায় সব

না-ফুরানো কবিতার মতো
না-দেখা স্বপ্নের মতো
তোমার মতো

কথা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

যেন সবটুকু বলে দিতে হবে, হতো...
যা কিছু হৃদয় উৎসারে অধীর অস্ফুট
যা কিছু নিসর্গ-চেতনায়,
রূপের প্লাবনে একাকার
মননের গভীর অন্তরে যেই কথা
মাথা কোটে, উৎসের খোঁজে
সবটুকু আহত সুর
বলে দিতে সাধ হয়...

তবু এক ক্লান্ত সময়
দেয় না সে অধিকার।
কফি-কাপ ঠাণ্ডা হয়ে আসে
ইতস্তত কাব্যের মূল্য, সামাজিক আলাপের মাঝে
চলে যায় বিষণ্ন, সহর্ষ, উৎসুক সময়
আরও একবার
না বলা কথার হাত ধরে···

কৃষ্ণচূড়া ঝরায় হলুদ পাতা
ভাড়া গাড়ি ছুটে যায় অলীক ঠিকানায়
নিবিড়, বিষণ্ন কথা
ঝরে যায় কবিতা শরীরে

কবিতা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

একটু আবেগ,
একটু মন হুহু
বুক-গলা চোখের জল
একটু ভেঙে যাওয়া আগল –
এটুকুই কবিতা

দু'একটা হিসেবের ভুল
দু'একটা দেরিতে পৌঁছানো
অনেকটা গরমিল
একবুক না-বলা কথা
বহু জীবনের দীর্ঘশ্বাস...
সেও কবিতা

ক্রমশ নদীর জল বাড়ে
ক্রমশ হাওয়ার গতি স্থির
কিছু অস্থিরতা তবু
কবিতার নিশ্চুপ অক্ষরে
কিছু ঝড়, আবিল ইচ্ছার –
কবিতার আলোর শরীরে

সেদিনও সে
এখনো যে সেইই...
মৃত্যুর দুরন্ত মিছিলে দাঁড়িয়ে
দিগন্তে তার সোহাগী হাতনাড়া...
অনন্তের যাত্রাপথে মুহূর্ত-প্রেয়সী
আমার সাথী,
আমার ভ্রম,
আমার কবিতা

দু'কথা:

কবিতা কী ও কেন এ বিষয়ে নানা মানুষ নানা যুগে নানা কথা বলে গেছেন। পাঠকের ও কবির জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা, তার স্বচ্ছতা-তীব্রতা-বিষণ্ণতা-উচ্ছ্বাস, সে জীবনের ছবি না অলীক মুক্তি এই নিয়ে নানা তর্কবিতর্ক। তর্কের যেমন শেষ নেই, মানুষের জীবনে বিস্ময়েরও তেমন শেষ নেই। প্রতিটি নতুন দিন বয়ে নিয়ে আসে এক অনাঘ্রাত অনুভব, মুখোমুখি হয় মানুষ এক নতুন সত্যের। সেই সব অনুভব ঝরে পড়ে কবিতায়। কখনো কবির নিজের, কখনো তার আশেপাশের মানুষের। কেউ তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলেন, কেউ বা ঘটনা থেকে অনেক দূরে গিয়ে যখন মনের তরঙ্গ কিছুটা সুস্থির, তখন। কবিতা ঠিক জীবনেরই মতো, এক বহতা নদী যেন। সেখানে সবটুকু ছায়াই এসে পড়ে। তবু সে ছায়াই তো, সত্য তো নয়। নিজের অনুভব কবিতায় লিখে ফেলে কি মুক্তি পান কবি? সে কবিতা কি ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ গন্ডি থেকে বেরিয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে? একটি মানুষের একশো বছর আগের অনুভব কি স্পর্শ করতে পারে নতুন মানুষের মন, আচমকা পেয়ে-যাওয়া পুরনো বইয়ের ছেঁড়াখোঁড়া পাতার অক্ষর ছুঁয়ে? করে তো, অহরহই দেখছি তো, জানছি তো। সে জানাটুকুও এক পবিত্র সফর, জীবনের মতোই। প্রবাস বন্ধুর জন্যে কবিতা বাছতে গিয়ে দেখলাম কবিতা প্রসঙ্গ সরাসরি এসেছে কয়েকটি কবিতায়। তাই কবিতা অনুষঙ্গের এই কটি কবিতা একত্রে পড়াতে সাধ হ'ল।

উদ্দালক

পিকনিক

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশে পাত পেড়ে চাঁদ কেউ সাজিয়ে রেখেছে
অপেক্ষা করছে সময়
শুকনো থালার গায়ে ফুটে উঠল দু'চারটি তারা

তুমি সেই বৃক্ষের আত্মীয়
পৃথিবীর স্নান শেষে
খিদে নিভিয়ে দিতে জ্বেলে দিয়েছ বিপুল আঁধার
ওরা এসে তাকে রোজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক

রাত্রির নিবিড় ঘুমে কারা আসছে,
কারা দূরে চলে যাচ্ছে আকাঙ্ক্ষার উদ্ভাসিত পথে

এখানে ভিড়ের মধ্যে জমে আছে স্তব্ধ কোলাহল

তুমি এলে আমিও এলাম
রিক্ত এই পৃথিবীতে এখন পিকনিক

তারপর অস্পষ্ট ছবির দেশে চলে যাবে বাস্তবের মোহমগ্ন চাঁদ।

কলম, তুমি

সুজয় দত্ত

কে বলেছে কলম নাকি তরোয়ালের চেয়ে সদাই
অনেকখানি শক্তি ধরে বেশী?
পরীক্ষা দিক কলম, যখন বিশ্বজুড়ে দাপিয়ে বেড়ায়
দৈত্যরা সব ফুলিয়ে মাংসপেশী।

কলম শুধুই শক্তিশালী যখন সে নির্ভীক আঁচড়ে
সত্যটুকু জানিয়ে যায় লিখে।
করবে কী সে এই দুনিয়ায় – সত্যেরই নেই সংজ্ঞা যেথায়,
সত্যরূপী মিথ্যা দিকে দিকে?

দত্যিদানোর আড়াল থেকে ভূতেরা সব কীবোর্ড টেপে
ছড়ায় গুজব রক্তবীজের মতো।
ছুটছে জীবন, ব্যস্ত সবাই, সত্য বাছার নেই তো সময়,
গিলছে দেদার আজগুবি "ফ্যাক্ট" যত।

পৃথিবী আজ মস্ত বাজার, কিনছে মানুষ হাজার হাজার
আধপোড়া সব মিথ্যে নগদ দামে।
কলম সেথায় পথের ধারে একলা মলিন দোকানঘরে
সত্য বেচে – তার ডাকে কেউ থামে?

মিথ্যে এ-ট্রেন মিথ্যে চাকায়, মিথ্যে বেচার অঢেল টাকায়
গড়গড়িয়ে চলবে যতদিন,
কলম, তুমি কাঁদবে একাই, থাকবে না কেউ তাকিয়ে দেখার।
কলম, তোমার কণ্ঠ রবে ক্ষীণ।

তাই বলে কি ছাড়বে তুমি নিজের ভিটে, নিজের ভূমি,
সত্য লেখার আজন্ম অভ্যেস?
মিথ্যে-দানব নিজের ভারে আছড়ে যেদিন পড়বে ভুঁয়ে –
লিখবে তুমিই, "রাত্রি হল শেষ"।

একটি ফোনালাপ

Wole Soyinka (ওলে সোয়িঙ্কা)
(অনুবাদ: সুজয় দত্ত)

[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে লন্ডনে প্রথমবারের জন্য আসা এক কৃষ্ণাঙ্গ ভাগ্যান্বেষী বা শরণার্থীর একটি মাথা গোঁজার আশ্রয় ঠিক করতে গিয়ে, অর্থাৎ একটা ঘর ভাড়া নিতে চেয়ে, সেই বাড়ীর মালকিনের সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা বলার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাই তুলে ধরেছেন এই কবিতায় নোবেলজয়ী নাট্যকার/কবি ওলে সোয়িঙ্কা।]

ভাড়াটা মাঝারি, জায়গা মন্দ নয়
বাড়ীওয়ালি নিজে থাকে একদম কাছে।
বাঃ, খুব ভাল। কালই তবে দেখে আসি?
একটা জিনিস শুধু জানাবার আছে –

ম্যাডাম, এসেছি আফ্রিকা থেকে আমি,
আশা করি নেই আপত্তি কোনো এতে?
ফোনের ওপারে নীরবতা নেমে আসে,
সময় লাগছে উত্তর খুঁজে পেতে।

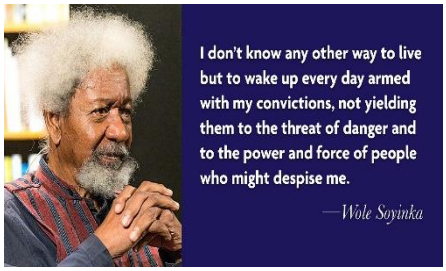

রিসিভার বেয়ে সে-শীতল নীরবতা
দুই কানে করে তীব্র চপেটাঘাত –
চাবুকের মতো ফালাফালা করে পিঠ
সাদা চামড়ার আভিজাত্যের ডাঁট।

ওপারে হয়তো লিপস্টিক-রাঙা ঠোঁট
রোল্ড গোল্ডের চশমাটা তুলে নাকে
লেডি সিগারেটে সুখটান দিয়ে ভাবে –
একথার পরে আর কী বা কথা থাকে?

হঠাৎ সে-ফোন আমায় চমকে দিয়ে
প্রশ্ন শুধায় রুক্ষ, কঠিন স্বরে –
"কত কালো তুমি? শ্যামলা না কুচকুচে?"
আমি একা সেই ছোট্ট ফোনের ঘরে –

নিজের কানকে বিশ্বাস করা শক্ত।
স্বপ্ন এ নয়, নিছক বাস্তবতা।
অবচেতনের কামড়ে ঠোঁটেতে রক্ত।
প্রাণপণে জিভ খুঁজছে জবাবী কথা।

রায় দিল মন আত্মসমর্পণে।
নিজেকে সামলে মৃদুস্বরে বলি, "আজ্ঞে?"
বিরক্তি-মাখা গলা ভেসে আসে ফোনে –
"স্পষ্ট কথাটা ঢোকেনি মাথায়? যাকগে,

বলছি আবার। কুচকুচে, নাকি শ্যামলা?"
"বুঝেছি ম্যাডাম, চাইছেন এটা জানতে –
মিল্ক চকলেট আমি, নাকি তিতকুটে
ডার্ক চকলেট?" গর্জন ওইপ্রান্তে –

"ঠাট্টা হচ্ছে? সাহস তো নয় কম!"
তাড়াতাড়ি বলি, "না না, সরি ম্যাম, আমি
সেপিয়া রঙের, পশ্চিম আফ্রিকার।
পাসপোর্টে আছে। এদেশে যখন নামি,

ওকথা লিখেই মেরেছিল ওরা ছাপ্পা।"
পাল্টা প্রশ্ন অবিশ্বাসের গলায় –
"সেটা কী আবার? আশা করি কোনো ধাপ্পা
নয় এটা, নেই ফন্দি তলায় তলায়?"

"আচ্ছা ম্যাডাম, ব্রুনেট তো জানা আছে?
সুন্দরীদের বাদামী রঙের চুল?"
"সে তো বেশ গাঢ়। চকলেট তার কাছে
অনেক হালকা।" "না না, করছেন ভুল –

মুখটা আমার যদিও কালচে-ঘেঁষা,
বাকি দেহটা তো সেই রং নয় পুরো।
হাতের চেটোয় পায়ের পাতায় সাদা,
রোদে বসে বসে নিতম্ব ছাই-গুঁড়ো।"

"আরে আরে ম্যাম, একটু শুনুন, একী –
ফোন রেখে দিলে আমি তবে কোথা যাই?
দূর থেকে রং যায় না তো ঠিক বোঝা –
মুখোমুখি ডেকে নিন না করে যাচাই!"

আমার আর কবি হওয়া হ'ল না

সফিক আহমেদ

ভালবাসাকে অনেক আলংকারিক রূপে দেখলাম
ভালবাসা বয়ে গেল অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার মতো
ভালবাসার ব্রীড়া কালো মেঘচেরা বিদ্যুতের চমকে
ভালবাসা ঝরে পড়ল ভরা-বর্ষা হয়ে
ছড়িয়ে থাকল মাটির উপর বকুল ফুলের চাদর হয়ে
ভালবাসা ওম দিয়েছে পশমিনা শাল হয়ে,
প্রেমের পালক ঘুম পাড়িয়েছে বিনিদ্র চোখকে
ভালবাসার প্রতিবেদন,
ভিজে চুলের ঝরেপড়া জলবিন্দুর স্পর্শে
চিবুকভরা নোনতা জলের আর্দ্রতায়
ঠোঁটের কোণের মিষ্টি হাসির ঝলকানিতে

এত এত অলংকারের পর
ভালবাসা যখন কড়া নাড়ল সদর দরজায়
নিঃশর্তে সমাহিত হ'ল প্রসারিত বক্ষে
আমি আর কবি থাকতে পারলাম না
প্রেমিক হয়েই চিৎকার করে উঠলাম
আমি তোমায় ভালবাসি...
শাওন।

শিল্পী: সফিক আহমেদ

ইচ্ছা করে

সফিক আহমেদ

যখন
ছুঁয়ে দেখি তোর ভিজে চুলের ঝরেপড়া জলবিন্দুটা
ছুঁয়ে দেখি তোর চিবুকভরা নোনতা জলের আর্দ্রতা
ছুঁয়ে দেখি তোর ঠোঁটের কোণের মিষ্টি হাসির ঝলকানি
ছুঁয়ে দেখি তোর চুঁইয়েপড়া স্বেদবিন্দুর হাতছানি

ইচ্ছা করে রাঙিয়ে নিতে স্বপ্ন আমার তোর রঙে
ইচ্ছা করে হারিয়ে যেতে দিন-দুপুরে তোর সনে
ইচ্ছা করে আমার বুকে তোর পায়েরই আলপনা
ইচ্ছা করে জাগিয়ে তুলুক সপ্তসুরের মূর্ছনা

আকাশ কুসুম কল্পনারই জাল বুনে যাই নিভৃতে
ভাবুক মনকে চাবুক মেরে ফিরিয়ে আনি সম্বিতে

বিপদ

সফিক আহমেদ

বৌটা আমায় বড্ড বকে,

ভাল কিছু খাবার পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি,
বৌটা বলে মুখ বেঁকিয়ে আমার হ্যাংলামি।
সুন্দরী কেউ সংগ দিলে সব ভুলে যাই আমি,
বৌটা বলে মুখ ঝামটে আমার আদেখলামি।
এয়ার বন্ধুর সঙ্গদোষে দু'ঢোক গিলি আমি,
বৌটা বলে চোখ কুঁচকে আমার মাতলামি।
সবই ছেড়ে ভদ্রভাবে কবিতা লিখছি আমি,
বৌটা বলছে এ আমার নতুন এক আঁতলামি।

কী যে করি...

একলা

শান্তনু মিত্র

একি কারাগার জীবনে আমার!
শিকলে বন্দী মন।
আর কতদিন আর কতকাল
বলবে সে কোন জন?
আনমনে তাই বাঁধন খুলেছি।
মেলেছি মনের পাখা।
আকাশেতে ভেসে পাই দিনশেষে
তেপান্তরের দেখা।
পেতেছি আসন ঘাসের উপর
সেই ধু ধু প্রান্তরে।
জগতের এই 'একাকীত্ব' কি
এইবারে চোখে পড়ে?
মত্ত ব্যাকুল বাতাস আমার
দুই কানে কয় কথা।
আমার সঙ্গে ভাগ করে তার
একলা থাকার ব্যথা।
দিগন্তে ঐ আকাশ মাটির
মিলন ভুলায় মন।
লক্ষ যোজন বিভেদ ওদের
নয়কো আপনজন!
ধীরে হ'ল শেষ সন্ধ্যা আবেশ।
আঁধার ঘনিয়ে এল।
বিভোল আবেগে বসে ভাবি মনে
কত কথা এলোমেলো।
মাথার উপর লক্ষ তারার
আকাশ-প্রদীপ জ্বলে।
একসাথে নয় শূন্যতাময়
দূরে দূরে ভেসে চলে।
স্বার্থবিহীন চাঁদ এনে দেয়
চন্দ্রিমা উপহার।
কেউ জানে তার মনের বাসনা!
বন্ধু আছে কি তার?

আমার তাহলে কোন অনুযোগ,
কী কারণে অভিমান!
মনের ভিতরে 'সঙ্গ' তো আছে।
লুকিয়ে রয়েছে গান।
'সঙ্গবিহীন' এ জগৎ নিয়ে
সাজাও তোমার ডালা।
তোমার সুরেই সকলে মিলেছে
খেলছে মিলন খেলা।
ত্রিভুবন মিলে সব দায়ভার
রয়েছে তোমার কাছে।
তোমার মতন একলা এমন
আর কে কোথায় আছে?

আশ্বিন

শান্তনু মিত্র

ঘন কুয়াশায় নৌকা ভাসায়
রয়েছে আশায়, ঢেউ বয়ে যায়,
কোথা পৌঁছায়,
কে আছে সেথায়!

ওই দেখো তাকে – ভুলায় শিশুকে
ধরে থাকে বুকে ভালবাসে যাকে
তবু জাগে ভয়।

আকাশটা ভরা কত শত যারা!
তবু ছাড়া ছাড়া একা কাঁদে তারা,
শূন্যতাময়!

আমি কে – জানো কি, সত্যি না মেকি?
কোন কাজে থাকি; আর কত বাকি –
কে বলে আমায়!

অবয়ব

বাপন দেব লাড়ু

আছে এরকম অনেক জীবন একা,
আস্তিনে লুকোনো লজ্জায়, শিহরিত হয় আহ্লাদী ঘুম।

সনাতনী রোদ মেঘের খামে করে লুকোচুরি।
পুরনো গীটারে ধূমায়িত হয় ছেঁড়া সুর।
সৌহার্দ্য স্বজন, ভাঙা টেলিফোনে বয়ে যায় বেলা –
খালি হাত ছুঁয়ে আজ শুধু সহমরণ খেলা।
সেই গ্রাম, সেই ঘুঘু ভিটে।
ধানক্ষেতে আজও লেগে রক্তের ছিটে।

এসো কাছে, হাতে রাখো হাত,
ঘুমহীন চোখ, অবয়বটুকু পড়ে থাক ফুটপাথে।

ইতিহাস

বাপন দেব লাড়ু

গহীন মনে অভিমানের রূপালী মলাট,
জলের স্রোতেই নুড়ির বালি হওয়ার ইতিহাস,
আকাশ জুড়ে মেঘের নগ্ন নেশা –
চিবুক ছুঁয়ে থাকে জানালা রেলিং
শামুক স্নান হলেই, তোমার বুকে দ্বিপ্রহর ঘুম।
রাত গভীর হলে, নিবিড় জোৎস্না জড়ায় পিয়াসী ঠোঁট,
বিন্দু বিন্দু জলকণা রেখে যায় রাতের চিহ্ন,

রাত বিলিয়ে রাতে, সতীত্ব হারায় আরও একটা রাত।

মুহূর্তের সংজ্ঞা

দীপশিখা চক্রবর্তী

বিবাগী রঙ আকাশ ছুঁয়ে গেলে নিঃস্বতার সংজ্ঞা লেখে জীবন,
উদাসী হাওয়া, মরীচিকা ভিড়;
স্পর্শে শুধু হাতড়ানো এক নরম ক্লোরোফিল ছবি,

একটু ছুঁতে চাওয়ার অপেক্ষা –
চোখের ক্লান্তি সবুজ মাখে যদি!

এভাবে পালিয়ে বেড়ানোই যে বৃথা!
বরং পড়ন্ত রোদ্দুরেই না হয় লেখা হোক
কিছু মুহূর্তের আত্মসমর্পণ।

আয়না

অমিত দে

এখুনি সরিয়ে রাখো আয়না
আমি মুখ লুকোলাম
দেখাব না

আমার অসহ্য লাগে নিজেকে
এতখানি রুগ্ণ দেখতে, বাঁকা
থুতনি, মুখের ওপরে স্তম্ভিত সন্ত্রস্ত
নাক, ভেজা দুটি চোখ, চর্চাহীন
ধূসর চুলের গুচ্ছ...

এখুনি সরিয়ে রাখো আয়না
নয়তো আমাকে ঘর থেকে
বের করে দাও, নির্বিঘ্নে
একবার জন্ম নিয়ে এত শোক, এত
দাহ, পরদ্রোহী কলা, কাতরতা...

কথা শোনো কথা শোনো
এখুনি সরিয়ে রাখো আয়না
যাবজ্জীবন এ যেন বিদ্রূপ এক
আমার আর সহ্য হয় না।

শাড়িতে নারী

অমিত দে

শোনো গো বঙ্গললনা
শাড়িতে তুমি অনন্যা!
চুড়িদারেতেও ভাল, ভাল সালোয়ার,
শাড়িতে নারী, তোমার জুড়ি মেলা ভার।
যতই তুমি পরো জিনস্, টি-শার্ট,
শাড়িতেই নারী তুমি বেশি স্মার্ট।
ঢাকাই শাড়ি পরলে তুমি ঢাকেশ্বরী,
চেন্নাই সিল্ক পরলে তোমায় লাগে মাধুরী।
শান্তিপুরের তাঁত-শাড়ি তোমায় দেয় শান্তি,
ধনেখালি পরলে তোমার সরল দেখায় মনটি।
বেনারসী পরলে তুমি বিয়ের কনে,
শাড়িতেই নারী তুমি হয়েছ ধন্যে!

নিবারণ চক্রবর্তী

শঙ্কর তালুকদার

নিবারণ চক্রবর্তী ঘুরে বেড়ায়
বাঁধানো খাতায় নেই তার কবিতা
কবিতা তার মনে
কখনও ছেঁড়া কাগজে।
অমিতের হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল
তাকেই প্রেসিডেন্ট করতে।
সভায় হৈচৈ রব
সবারই প্রশ্ন, এ কোন সম্পদ।

অমিত বললে, নমুনা রাখছি,
'কে আমি প্রশ্ন তোমাদের
সে কি জানার আগ্রহে
নাকি কৌতুকে করবে হরণ
আমার আমিত্ব বোধ?

বৈশাখের বুকফাটা মাঠ
আষাঢ়ের জলে নেয়ে
সবুজের আভাসে যায় ঢেকে
ধরে ফুল বসন্ত বাতাসে
তবে কেন ত্যাজ্য হবে
রসহীন শুষ্ক রুক্ষ বলে।'

অমিত হাত ছুঁড়ে বললে,
'এই হ'ল নিবারণ চক্রবর্তী –
তার ভাষাতে আরও বলি,
আমি তোমাদের লোক
নব আগন্তুকেরে ফিরায়ো না
অবহেলা ভরে,
আমার ছন্দে হয়তো দ্বন্দ্ব
হবে প্রতি ঘরে ঘরে।'

সভায় ওঠে রব, ঘোর বিপদ
যারে তারে আশ্রয় দিলে
আমাদের মান যাবে চলে,
সংস্কৃতির যে মূল্য আছে
নিবারণ কি বোঝে তারে।
শুধু তর্ক, শুধু বাক্যবাগীশ
শুদ্ধ সভ্যতার মাঝে
এনে দেবে বিষ।
শাস্ত্রের বিধিতে ধ্বংস হোক
এমন বিপরীত আচার।

অমিত উঠে দাঁড়িয়ে বললে,
'নিবারণ যাবে না অত সহজে –
তার কথাতেই বলি,
আজ যা ভাল, মন্দ যদি কাল
মন্দ বলে কেন গালাগাল,
আজ যে অপরিচিত
তারেই খুলে দিতে হবে দ্বার
তবেই হবে সমৃদ্ধি সভার।'

খোকার স্কুল

শঙ্কর তালুকদার

স্কুলে আর পাঠাস না মোরে
ওদের ভাষা সহজ নয় তো মোটে
তোর মতো আপন করে বলতে
কেন বাধা ওদের মনে।

বাংলা ভাবছি যখন
ইংরেজিকে হাজির হতে হবে
'গুড মর্নিং' বলে
এটিকেট মানতে হবে।

স্কুলে আর পাঠাস না আমায়,
অঙ্ক কষছি দেখে
শাস্তি দিল মিছে
ঘন্টা তখন অন্য ক্লাসের তরে।

বল মা, বল
ঘন্টা কবে বলতে শিখল বল,
মিছে ওরা করে রাগারাগি
ঘন্টা শুনে কোন বিষয় কেমনে জানি।

স্কুলে আর যাব না গো মা
তোর কাছেই পড়ব মন দিয়ে
ফাঁকি দেব না
একটুও ফন্দি করে।

খেলায় ছিল না রুচি
সেটাই নাকি দোষ
নিয়ম ভেঙে তাই
দোষী হই রোজ রোজ।

স্কুলে আর পাঠাস না মোরে,
টিফিন হলেই যত ক্রোধ
আমার খাবার কাকে দেব
তাতেও বাঁধে বিরোধ।

দশজনাতে ছিল সেদিন
ঘরের একটি কোণে
চেয়ার ভেঙে আমার নামে
দোষ দিল বিনা কারণে।

স্কুলে আর যাব না মাগো
মিথ্যে কেন হব সাথী
দল করে ছল করে
দিনকে করে রাতি।

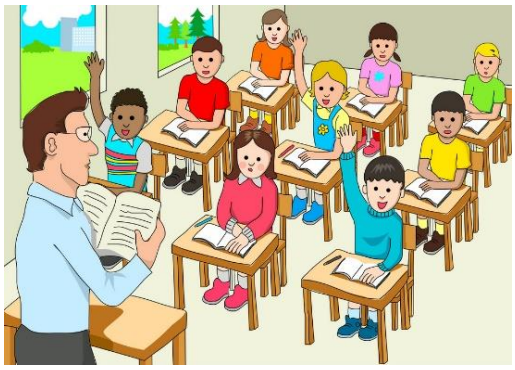

বুনো ফুল আমার বিশ্বাস

সৌমি জানা

একটা ডাল-ভাত-চচ্চড়ির জীবনে আমার অভ্যেস
হাওয়ায় শুনি অনেক ফিসফিসানি
কিন্তু কান পাতি না... হয়তো বা পাতি
কখনো সখনো, তবে হাত বাড়াই না
ছাপোষা মধ্যবিত্ত মন তো
সব সময় একটা হারানোর ভয় থাকে –
না না, বহুমূল্য কিছুই তো নেই আমার হারানোর,
ভয়টা বেশিটাই নিজেকে হারানোর
অথবা রাস্তা হারানোর...
সেই ছোট্ট থেকে শিখিয়ে দেওয়া বাঁধা গৎ, চেনা ছক
যদি হারিয়ে ফেলি, তাও এই মাঝ বয়সে
তখন কি আর নতুন করে ধ্রুবতারাটির খোঁজ পাব,
যেটি দেখাবে পথের দিশা।
আজকাল প্রায়ই একটা বুনো ফুলের গন্ধ পাই...
গন্ধটা আস্তে আস্তে কেমন যেন শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে যায়
একটা অচেনা ঘ্রাণ, অনেকটা বিষের মতো মিষ্টি
হৃদয় ফুটো করে একেবারে মরমে ঢুকে যায়
কিন্তু সেই ভয়টা আর করে না
মনে হয় ছাড়তে শেখার খেলাটা এবার বুঝতে শুরু করেছি।

বেশ ছোটবেলায় লুডো খেলতে শিখেছিলাম
ঘুঁটি হারালেই কান্নাকাটি
ঘুঁটির ঘেঁটি ধরে ছুটে চলো
কিন্তু ছক্কার ওপর তো কারোর হাত নেই
তবে জিৎ হবে সব ঘুঁটিকে মুক্তি দিয়ে
একদম বোর্ডের বাইরে
ঘুঁটিদের পায়ে পায়ে ছাড়তে দেওয়াটা
এতদিনে শিখতে শুরু করেছি
তাইতো বুনো ফুলের গন্ধটা মাঝে মাঝেই জড়িয়ে ধরে
চোখ বুজলে রঙিন ছবিগুলো এখন আর ততটা স্পষ্ট দেখি না
যেগুলোর দিকে তাকিয়ে অনেক রাস্তা হেঁটেছি – চোখ বুজে
এও সেই ছোটবেলার অভ্যেস, জলছবি ঘষে ঘষে রং বার করা
সেই পাগলামিটাও কাটিয়ে উঠছি,
সত্যি কত যুগ লেগে গেল বড় হতে
ভাবলে অবাক হই, কত বোকামি করেছি প্রতিদিন
চূড়ান্ত হাস্যকর বৈকি!

আজ বুঝেছি বেঁচে থাকার জন্য স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন নেই
ওটা উদ্বৃত্ত, ওতে অকারণে মন ভাঙে
কাঁচের মতো চুরচুর, আর জোড়া লাগে না
তাই স্বপ্নপ্রেমীরা আজ বাতিলের দলে
কিন্তু ওই মিষ্টি বিষ গন্ধটা বেশ নিজের মতো লাগে
মাথায় ঘুরপাক খায়
কেউ তো জড়িয়ে আছে আমার চেতনায়
একদিন হেঁটে যাব জ্যোৎস্না মেখে
বনের পথে, বুনো ফুলের গন্ধ ঠিক চিনিয়ে দেবে রাস্তা
বিষের বাঁশি হয়তো ডেকে নেবে কাছে
স্বপ্ন নয়, এ এক চূড়ান্ত বিশ্বাস।

উঠে এসো অন্ধকূপ থেকে

নার্গিস পারভিন

বেশ তো ছিলে
রোজকার অফিস ভাত,
আটটা দশের লোকাল ট্রেন,
স্নায়ু টান টান ব্রেকিং নিউজ
আর ছুটির দিনের ভাতঘুমে।

এ কোন ঘুমহীন রাত ওই চোখে?
কোন ঘূর্ণিতে ঘুরছ চক্রাকারে?
সব চেনা চেনা মুখে
কোন অচেনা হাতছানি দেখো?

এসো মাথা রাখো এই ক্রোড়ে,
আঙ্গুলের পালক ছোঁয়ায়
ঘুমাও বকুল ছায়ায়।

এসো আলিঙ্গনে,
অবগাহনে সিক্ত হও
এই স্বচ্ছতোয়ায়।

ধুয়ে ধুয়ে যাক সব গ্লানি
মুছে যাক গাঢ় আঁধার।

তুমি কবিতা জন্ম হও।

জলটুঙি মন

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

দেওয়ালের পেরেকে টাঙিয়ে রাখি
আমার জলটুঙি মন, যাতে না হারিয়ে যায়
নামহীন কোনো নদীর মতো বয়ে যেতে যেতে
বাতাসে ভেসে আসে সেদিনের চুপকথা
তুমি সরে যাচ্ছ ক্রমশ ভাঙনের মুখে
এই আলোয় ভিজিয়ে দাও চিকন সাধ
সেই অপরূপ রমণীয় উপচে পড়া ভোর
কচি আঙুলে কুড়ানো শিউলি আমার,

ভাল করে দেখো উদাত্ত গহন মোহে
বেদনা এনেছ কত আজ!
কত রাত হ'ল জানো?
ঢাকা দিয়ে রেখে যাও জীবনের সঞ্চয়
অতুল অশুভ সঙ্কেতে
হঠাৎ কখন উড়ে যায় পরিযায়ী মানুষেরা
পাখিরাও চলে যায় খুলে রেখে বিগলিত ডানা
নৌকা করে সাধ আসে থরে থরে
আমার জলটুঙি মন দূর থেকে সব দেখে

নীলাঞ্জন

বৈশাখী চক্কোত্তি

পর পর প্রকোষ্ঠ | একী মৌচাক?
কিন্তু এ তো মৌমাছির গুঞ্জন নয়!
যেন কালো কালো মানুষের মাথা মনে হয়!
ভীষণ অন্ধকার! টিমটিমে আবছা আলো
পাতালের কারাগার | হা ভগবান!
এ যে দেখি শুধু কয়েদীরা বসে ঝিমায় |

আচ্ছা, আমি এখানে এলাম কী করে?
কে বলবে আমায়? শেষ কবে দেখেছি তোমায়?
কিছুই পড়ে না মনে | প্রিয় স্বপ্নের সওদাগর!
আমি তো চেয়েছিলাম প্রেম বুনতে তোমার দুচোখে
অপরাধ কি একমাত্র সেটাই? অন্ধ আবেগতাড়িত
আমার হৃদয় | তাই অন্তিম আশ্রয় এই কারাগার |

নীলাঞ্জন! নীল যন্ত্রণার শরে বিদ্ধ আমি অকারণ
বনজ্যোৎস্নায় হারাতে চেয়েছিলাম সবুজ শ্যামলিমায়
হাঁটতে চেয়েছিলাম হাতে হাত রেখে স্পর্শকাতরতায় |
কারাগারে নিক্ষিপ্ত আজ, অযথা মন ক্ষতবিক্ষত
প্রেমের নিদারুণ পরিহাস, টলটলে শিশিরসিক্ত কাম্য আবাস,
রক্তাক্ত বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে কত আর ঘুরব প্রহেলিকায়?

ভাসিয়ে দাও

সুব্রত ভট্টাচার্য

দীর্ঘ অপেক্ষায় কী তুমি আছ
বুক সৈকতে আছড়ে পড়ছে আগুন ঝরা ঢেউ |

সমুদ্র বরাবর চিরযৌবনা
সাবেকী সোহাগে আছড়ে পড়ে;
সেই একই উন্মাদনা |

আর তুমি, একটাই দুঃখী নদী বয়ে বেড়াচ্ছ দিনরাত
চাইলে আর দশটা নদীর মতো মেলাতে পারো হাত |

লজ্জা কীসের? ভাসিয়ে দাও সাম্পান
সাঁঝের কুপি জ্বেলে
প্রেম প্রণয়ে ভেসে যাও
পূর্ণতা পেতে চাওয়া পাওয়ার
উপলব্ধিটুকু পূর্ণ হয়ে যায় |
সবার সুখ দুঃখই সমুদ্রের কাছে সমান |

খেলা

দীপান্বিতা সরকার

পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল যখন সৌরজগতে
মেঘ আর রোদের খেলা তখন থেকেই।
সূর্যের গামাখা রোদ্দুর আর মেঘের চাদর নিয়ে নীল শাড়িপরা
'আসমানী' প্রেমে পড়ল পাহাড়ের!
পাহাড় ছিল মৌন প্রেমিক।
বুকের বিশাল আবেগ ছিল লুকিয়ে
তার বুক চিরে পড়া ঝর্নার রূপালী কুঁচির আড়ালে।
মেঘ আর রোদের ঔরসে জন্ম নিল নারী-নদী।
উত্তাল যৌবনভরা তার রূপ
আছড়ে-পিছড়ে পড়ে পাহাড়ের চরণে;
চুম্বনে ভরিয়ে দেয় তার পাদদল!
পবিত্র জলকেলির আলিঙ্গনে নদীর যুবতী শরীর হয় তৃপ্ত!
পাহাড়কে ঘিরে তার ভরা সংসার গড়ে ওঠে দুই ধারে।
সই হয় ফলগুল্ম, পাখি, প্রজাপতি।
আদম ও ইভের মিলন হয়।
প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে চলছিল সব এমনিই... হঠাৎ একদিন
নদী ধর্ষিতা হয় দু'পেয়ে উদর সমস্ত ক্লীবের লালসায়।
পাহাড়কে খুবলে-কুরে খায়,
তাদের তথাকথিত সভ্যতার অট্টালিকা।
কংক্রিটের সুডৌল গড়নে
তার আধুনিক কর্পোরেট যৌনতা রংচং মেখে
শরীরের হাট বসায়।
ক্ষণিকের সস্তা সুন্দর চাহিদা হাতবদল হতে থাকে
এমনিভাবেই!
নিখুঁত যন্ত্রের মতো সন্তান লাল, নীল, কমলা পোশাকে
পাঠ পড়ে ভূগোল, বিজ্ঞান ও অর্থনীতির।
গড়ে ওঠে ক্লীব-সভ্যতা!
উদরের মস্তিষ্কে লোভের জন্মলাভ।
ক্লীব-সভ্যতার ক্ষুধা গ্রাস করে মাটি,জল, আকাশ বাতাস!
ডাক আসে বিজ্ঞানের সংখ্যা কমাতে হবে।
জন্ম নেয় স্পর্শ রোগ!
নিখুঁত যন্ত্রের মতন ক্লীবের হত্যা করে ক্লীব!
স্পর্শ যখন স্পর্শকাতর,
নির্বাক দর্শক হয় প্রকৃতি।
চিতার প্রতিধ্বনি, মুক্ত বাতাসের নাম অক্সিজেন সিলিন্ডার...
শেষ বিদায় প্রিয়মুখ আত্মীয়-পরিজন শূন্য!
মেঘ আর রোদের খেলা চলে,
চলতেই থাকে...
চলতেই থাকবে!

নিখোঁজ

দীপান্বিতা সরকার

মনখারাপ... ভীষণ মনখারাপ!
বুকে চাপ চাপ কষ্ট...
দীর্ঘশ্বাস নয়, বরং টানা নিশ্বাস;
দলাপাকানো ছোট্ট ছোট্ট বাঁধা-বাঁধা প্রশ্বাস!
কোনো কারণ ছাড়া, এই মনখারাপগুলো বড্ড বেশি নিজের!
গোপন আর বালিশে মুখ গোঁজা...
অথবা জানলা দিয়ে বেরিয়ে ঐ আকাশের একলা তারার পাশে
চুপটি করে বসে থাকা।
নয়তো ভাত পুড়ে যাবার সম্বিৎ!
কেবল গুহার দিন... নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেওয়া!
অকারণে কাপড়ের আলমারি গোছানোর অজুহাত;
নয়তো পুরনো অ্যালবাম খুলে বসা, বাদামি চিঠিপত্রের মধ্যে
নিজের নিখোঁজ খোঁজ!
কী যেন নেই...
শুধু হাতড়ে বেড়ানো... অকারণে!
রোদের কাপড়গুলো যেন হঠাৎ আসা বৃষ্টিতে ভিজে একসা,
কার্নিশে বসা ঐ কাকটার মতন ভিজে একাকার।
বৃষ্টি থামলেও মন খারাপ কি কম হবে?
শীতের রাতে যদি কেউ গায়ে চাদর টেনে দেয় তাহলে হয়তো
বা... হয়তো না।
কী জানি!
বড্ড মনখারাপ!

জীবনের গান

নমিতা রায়চৌধুরী

তার কথা মনে পড়ে।
মনে পড়ে –
নবজাতকের স্বর্গীয় আভা,
ভৈরবী-রাগিণী পশমিনা ওমে!

মনে পড়ে চির কিশোরী তুমি,
আগুনরঙা ফাগুন রাতের
মহুয়া মাদল বুক দুরু দুরু –
প্রথম চিঠি।

মনে পড়ে জীবনের গান।
ঘাত প্রতিঘাত,
চৈত্রের খরদাহে দুরন্ত তুমি –
পথ চলা অনিবার!

মনে পড়ে গো,
খুব মনে পড়ে।
উদাসী হাওয়ার প্রহর,
বাদলের গান, অব্যক্ত অনেক কিছু।

বেলা বয়ে যায়,
মেঘেরা ভাসে মেঘের গায়ে লেগে,
বিরহ বিচ্ছেদে –
মনে পড়ে অন্তিম অবকাশে!

পথিক তুমি, ওগো অজানা!
বলে যাও –
কী বার্তা রেখে যাও শূন্য শাখায়
নবীনের আয়োজনে...।

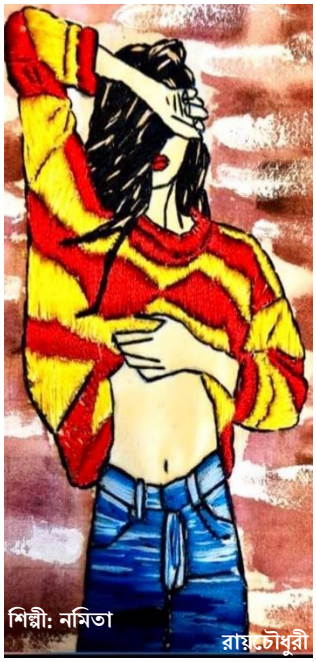

কষ্টিপাথর

নমিতা রায়চৌধুরী

আমি বরং পাড়েই বসি।
জানিসই তো,
আমরা আর বন্ধু নই।
তোরা ক'জন ডুব সাঁতারে
ডুবকি লাগা,
জলের ভিতর কালো রং –
জলকে ভাসা!
রবির সুরে নাচছে নদী,
গাইছে হাওয়া,
মন ভাসানের আকাশ পাতাল
"দেখব তোদের তরী বাওয়া!"
লাল নীল সাদা কালো,
শ্বাপদ ফণা!
কত রকম স্রোতের প্লাবন!
হাসি কান্না, বদলে যাওয়া
মিথ্যে সত্যি,
ব্যভিচারের অনুশাসন।
হ্যাঁরে,
পাতাল ছুঁয়ে কী ধন পেলি?
হীরের গয়না!
আহা, কী আনন্দ!
যাচাই করতে ফের ভুলিস না।
বন্ধু চেনার কষ্টিপাথর
সেটাই নাকি এই বাজারে অমূল্য ধন!

কেন চাও বুড়ো হতে

রঙ্গনাথ

কেন চাও বুড়ো হতে?
চেও না দ্রুত বেগে ধাও জীবনের পথে।
সময় নিয়ে কেন তাড়াহুড়ো এ জগতে?
চাও সময় চলে আস্তে-ধীরে কচ্ছপের মতো
ধীরে বুড়ো হও, মনটা রাখো শান্ত নিয়ত।
কেন চাও বুড়ো হতে?

আস্তে চলো, কাজ করো — সময় তো প্রতুল!
চেও না কাজকর্ম করতে হয় হাজার ভুল,
চেও না সিরিয়াল দেখা হয় একমাত্র কাম —
এ করলে হবে না দেওয়া সময়ের প্রাপ্য দাম।
কেন চাও বুড়ো হতে?

চেও না রোগে ভুগে শরীরটা করো জরজর
চেও না ওষুধ খেয়ে দেহটা করো নড়বড়;
চেও না হাঁটু আর কোমরের ব্যথা থাকে
বাত ও হাড্ডির রোগ কুঁজো করে রাখে।
কেন চাও বুড়ো হতে?

চেও না কাজের সময় কাজ নিয়ে হও ক্লান্ত
চেও না ঘোরপ্যাঁচে পড়ে মনটা কর অশান্ত।
বুড়ো হলে চিন্তা যাবে বেড়ে, খিটখিটে হবে
কেন চাও সহস্র চিন্তা নিয়ে নিদ্রাহীন রবে?
কেন চাও বুড়ো হতে?

চেও না বসা থেকে উঠতে মাথা যায় ঘুরে
চেও না দাঁড়ানো হতে বসতে দেখাও থুরথুরে
চেও না হাঁটতে গিয়ে থাকো পড়ে সবার পিছে
সবার সাথে থাকতে গিয়ে রহো সবার নীচে।
কেন চাও বুড়ো হতে?

চাও হাঁটতে-চলতে পারো, দেহে থাকে বল
রাখো আশা-ভরসা, রাখো মন উচ্ছল ছলছল!
হবে না দুর্বল-অচল; ভেব না খুব অসহায়
চেও না ছোট্ট কামরাটা পৃথিবী হয়ে যায়।
খুব বেশী কিছু চেও না —
চাও হট্টগোল, চাও তাল-বেতালে ব্যস্ত থাকা —
তর্ক করো, ঝগড়া করো; পথ রাখো সিধে-বাঁকা।
চাও স্বজন আর বন্ধুরা সবাই থাকে পাশে
সক্ষম এক জীবন কাটে যৌবনের উচ্ছ্বাসে!

উন্নত রাখো শির

রঙ্গনাথ

যা চাও তাই পাও; লোকে মানে তোমার হুকুম
অবাধ্য যারা, তারা হয় দুশমন, হয় তারা গুম।
দাপট আর জন বলে তুমি আজ রাজা-উজির —
উন্নত রাখো শির!

ছিলে দরিদ্র, হয়েছ ধনী, লোকে করে গুণগান;
এ মহল্লায় নেই কেহ শক্তিধর তোমার সমান।
চাঁদাবাজি, জুয়াচুরি করে হয়েছ টাকার কুমির —
উন্নত রাখো শির!

কর-ফাঁকি আর ছল-চাতুরিতে হয়েছ বড় পাকা
এইভাবে অতি সহজে বানিয়েছ কত টাকা!
তোমার মতো কেহ জানে না এত ফন্দি-ফিকির!
উন্নত রাখো শির!

জবর দখল করে করেছ ঘরবাড়ি, দোকানপাট
লাঠিয়াল আর টিকটিকি সাথে রাখো দিনরাত।
এলাকাটা রাখো কব্জায়; খুঁটিটা খুবই গভীর —
উন্নত রাখো শির!

দুর্নীতি করেছ, তাই দুর্নাম; তাতে কী আসে যায়?
সুযোগ পেয়েছ, অর্থ এসেছে, সেটা নয় অন্যায়?
কেন থাকো ভয়ে ভয়ে, কেন আতঙ্কে অস্থির?
উন্নত রাখো শির!

টাকুয়ামেনন

সুজয় দত্ত

ছোট্ট একটা নাম-না-জানা হলুদ রঙের পাখী সামনের জুনিপার গাছটার ডালে বসে শিস দিচ্ছে মাঝে মাঝে। ব্যস, এছাড়া আর একটাই শব্দ। জলের। অনেক দূর থেকে শোনা যায়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রচন্ডবেগে গড়িয়ে আসা এই বাঁধন-না-মানা, দুরন্ত, সফেন জলরাশি অনেকটা নীচে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে যেখানে, সেখানটা ধোঁয়াধোঁয়া অস্পষ্ট। জলের ছোট ছোট ঘূর্ণি ইতস্ততঃ জেগে থাকা ডুবো-পাথরের মাথাগুলোকে ঘিরে। আর তারপর আঁকাবাঁকা নদী কুলকুল করে বয়ে চলে গেছে ঘন গাছগাছালিতে ঘেরা রহস্যময় বনপথে। সন্ধ্যা নেমে এল প্রায়। ধারেকাছে কোথাও কেউ নেই। একা আমি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ডুবে রয়েছি সেই জলতরঙ্গের মূর্ছনায়। এপ্রিলে এখানে বসন্ত ঠিক নয়, বসন্তের প্রস্তুতিপর্বের শুরু। দমকা, জোলো হাওয়ায় এখনো সদ্য-বিদায়-নেওয়া শীতের বরফগলা স্পর্শ। সেই হিমশীতলতা আমার মুখে, মাথায়, শরীরের অন্যত্র ছুঁয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি অনুভব করছি না। ভেতর থেকে এক গভীর ভাললাগার উষ্ণতা আমার সমস্ত চেতনাকে জড়িয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে। ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে আসা অন্ধকারের পটে এক নির্জন, চিরসবুজ বনানীর বুকের মধ্যে লুকোনো এই রঙিন জলপ্রপাত যেন একটা কবিতা – বারবার পড়েও পড়ার সাধ মেটে না। ইস, এই কবিতাটা যদি এক্ষুণি তাকে পাঠাতে পারতাম, যাকে নিয়ে আমার হৃদয়ের খাতায় পাতার পর পাতা কবিতা!

হ্যাঁ, রঙিন জলপ্রপাত। টাকুয়ামেননের জল যে লালচে-খয়েরী

আর হলদে-বাদামী, সেটা এখানে আসার আগে জানতাম না। এর বৈজ্ঞানিক কারণ লেখা আছে কাছেই একটা বাঁধানো ফলকে, কিন্তু এই মুহূর্তে তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি এখন শুধু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি এক মগ্ন, নীরব চিত্রকরের নিপুণ তুলিতে আঁকা এই জলরঙের ছবির দিকে। আর আবিষ্ট হয়ে শুনছি তার নিরবচ্ছিন্ন আবহসংগীত। সময়ের খেই হারিয়ে অন্ধকারে কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না,

একসময় পার্ক রেঞ্জারের গলা এল কানে। বন্ধ হয়ে গেছে পার্ক, যেতে হবে এবার। তীব্র অনীহা নিয়ে পা বাড়ালাম। এযাত্রা আর ফেরা হবে না এখানে। বেড়ানোর মেয়াদ ফুরিয়েছে। কাল সকালেই অনেকটা পথ গাড়ী চালিয়ে এখান থেকে বাড়ী, তারপর এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারপোর্টে দীর্ঘ ক্লান্তিকর উড়ানের শেষে দুই মহাদেশ পেরিয়ে পৌঁছাব আমার আসল বাড়ীতে – যেখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি, স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। সেখানে আমার জন্য প্রতীক্ষায় আছে আরেক শিল্পী। না, সে ছবি আঁকে না। গান গায় ভাল। কিন্তু আমি তাকে নিয়ে মনের ক্যানভাসে এঁকে চলেছি অজস্র রঙের ছবি। আর লিখে চলেছি কবিতা – গত প্রায় বছরখানেক ধরে; ওর সঙ্গে ফোনে-ফোনে, আন্তর্জালে আলাপ হওয়ার পর থেকেই। দুজনের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল বিস্তর। তাই প্রথম পরস্পরকে কাছে পেতে লেগেছিল ছ'মাস, গত বছর মাত্র কয়েকদিনের ছুটিতে উড়ে গেছিলাম যখন। তখনই প্রথম মুখোমুখি দেখা, নিবিড় করে চেনা, আর অগ্নি সাক্ষী রেখে জীবনের পথে একসাথে চলার শপথ। বাড়ীর সবাই ওকে পেয়ে তৃপ্ত, কিন্তু একবুক অতৃপ্তি নিয়ে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল একা। জীবনসঙ্গিনীকে পাশে পাওয়ার আগে নিয়মকানুনের কিছু বেড়াজাল ডিঙোতে হবে, সময় লাগবে তাতে। সেই ব্যাকুল অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে এবার।

****

"সত্যি, না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না জলের এমন রং হতে পারে।" কথাটা এল আমার বুকের কাছ থেকে। ওর একরাশ সুগন্ধী চুল আমার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে বুকে মাথা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে বসে আছে পর্ণা – পার্কের এক গাছপালাঘেরা নির্জন কোণে একটা বেঞ্চে। এখান থেকে ডানদিকে তাকালে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে জলপ্রপাতটা একটুকরো দেখা যায়। হ্যাঁ, টাকুয়ামেননের সঙ্গে গত বছরের সেই প্রথম দেখার প্রায় তেরো মাস বাদে আবার এসেছি তার কাছে। এবারে গাড়ীতে পাশের সীট যেহেতু ফাঁকা ছিল না, হাসিতে-গল্পে-গানে এতটা লম্বা যাত্রাপথ কখন কেটে গেছে টেরই পাইনি। জুনের গোড়ায় এখানকার আবহাওয়া মনোরম, তাই দর্শনার্থীর সংখ্যা সামান্য বেশী, যদিও তেমন ভীড় নেই। অনেকক্ষণ কাছ থেকে সকালের রোদ-ঝিকমিক জলরাশির সেই রঙিন পর্দাকে দুচোখ ভরে দেখার পর ক্লান্ত হয়ে কোথাও বসতে চাইল পর্ণা। সেই থেকে দুজনে এই বেঞ্চে বসে বসে জলের শব্দ শুনছি। নাকি তিনজন? ওর শরীরের মধ্যে তিলতিল করে বেড়ে উঠছে যে আসন্ন অতিথি, তার কানে কি পৌঁছাচ্ছে এই সলিল-সুরঝংকার? আর মাত্র কয়েকমাস পরেই তাকে দেখতে পাব – একথা ভাবলে রোমাঞ্চ লাগে। হঠাৎ পর্ণা বাঁদিকে অনেকটা দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "আরে, ওটা তোমার সেই অফিস কলিগ না? আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।" ঘুরে দেখি হ্যাঁ, ওই তো নীলাভ্র! ও এখানে আসছে জানতাম না তো! নীলাভ্র রায় আমারই অফিসের অন্য ডিপার্টমেন্টে আছে। সুঠাম, সপ্রতিভ, সুরসিক। ভাল পার্কাশন বাজায়, একটু আধটু গীটারও। একদিন নেমন্তন্ন করেছিলাম বাড়ীতে, পর্ণাকে নিয়ে আসার পর। ভালই হ'ল দেখা হয়ে, একসঙ্গে দুপুরের খাওয়াটা আজ বেশ জমবে।

****

"বাবা, ক্যান ইউ ফাইন্ড মি নাও?" কচি গলার ডাকটা কানে আসতেই চোখ বোজার ভান করে বলতে হ'ল "না তো।" নাহলেই মেয়ের অভিমান হবে, কাঁদতে কাঁদতে এসে বলবে "ইউ আর চিটিং। ওন্ট প্লে উইথ ইউ।" কিন্তু লুকোচুরি খেলতে খেলতে ওর ওপর নজর রাখতেই হচ্ছে সবসময়। এই পার্কে প্রতিটা পীচবাঁধানো রাস্তা বা ট্রেলই ঘন গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে গেছে। আমি সত্যি চোখ বন্ধ করে থাকলে ওই ছটফটে মেয়ে কোথায় কোন গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোবে – খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে তখন। সাড়ে চার বছরেই যা দুরন্ত হয়েছে, হিমশিম খেতে হয় সামলাতে। টাকুয়ামেনন স্টেট্ পার্কে এই প্রথমবার

বেড়াতে এসে ও অতি উৎসাহে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। একবার বলছে ট্রেল ধরে জলপ্রপাতের একেবারে তলায় গিয়ে জল ছোঁবে, আবার বলছে সামনের পাহাড়টার মাথায় উঠে ফল কালার দেখবে, পরমুহূর্তেই বলছে বনের মধ্যে বুনোফুল আর প্রজাপতি খুঁজতে যাবে। অবশ্য ওকে এমন খুশীতে উচ্ছল দেখব বলেই তো লেবার ডে-র সপ্তাহান্তে এখানে নিয়ে আসা।

ওর মা সঙ্গে এলে আরো মজা হতো, কিন্তু তার ঠিক এই সময়েই পরপর গানের প্রোগ্রাম পড়ে গেল। মেয়ে অনেকদিন থেকে বায়না করছিল কোথাও বেড়াতে যাবে বলে, তাই পর্ণাই আমাকে বলল নিয়ে যেতে। ও নিজে এখন গাড়ী চালাতে পারে, সুতরাং অসুবিধে নেই। তাছাড়া গানের অনুষ্ঠানে তো যাবে নীলাভ্রর সঙ্গে। ওরা দুজন আর দুই আমেরিকান ইন্সট্রুমেন্টালিস্ট মিলে একটা অ্যামেচার দল বানিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে বেড়ায়। মেয়ে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হওয়ার পর থেকে এ-ব্যাপারে নিয়মিত সময় দিতে শুরু করেছে পর্ণা। নীলাভ্রও যথেষ্ট সময় আর উৎসাহ দেয়। ওর স্বপ্ন এই দলটা একদিন পেশাদার হবে, রীতিমতো অ্যাডভান্স আর পারিশ্রমিক নিয়ে অনুষ্ঠান করবে। ও তো পর্ণাকে রাতদিন বলে মেয়ে আরেকটু বড় হলে বাড়ীতে গানের স্কুল খুলতে। অনেকে শিখতে চাইবে। আমি

অবশ্য বলি গানটা নেশা হয়েই থাক না – শিল্পের সঙ্গে ক্যারিয়ার মেশালে তার আনন্দটা চলে যায় না? যাইহোক, এটা স্বীকার করতেই হবে যে নীলাভ্রর মতো একজন আছে বলেই পর্ণার এতো সুন্দর গানের গলাটা কাজে লাগছে।

"বাবা, আই অ্যাম হাংরি। ক্যান উই গেট সাম লাঞ্চ?" ব্যস, ওপরওয়ালার নির্দেশ এসে গেছে, এবার তো যেতে হবে লাঞ্চের সন্ধানে। দৌড়ে এসে আমার কোলে উঠে পড়ে তুলতুলি।

****

পুরু, ধবধবে বরফের এক সর্বব্যাপী, কঠিন আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে প্রকৃতির রঙিন ক্যানভাস। যেন চিত্রকরের ষ্টুডিও এখন

বন্ধ কয়েকমাস। সেই লাল-খয়েরি লিকার চা আর সোনালী-হলুদ সুরার নিরন্তর স্রোত এখন রুদ্ধ, সেই অবিশ্রান্ত ধারাপাতের শব্দমুখর বন এখন স্তব্ধ। চারিদিকে এক জমাটবাঁধা শূন্যতার হাহাকার। সেই পুরনো স্মৃতিমাখা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে শীতের বৈধব্যরূপে দেখছি টাকুয়ামেননকে, আর ভাবছি এ কীসের দৃশ্য? আমার মনের ভেতরের, না বাইরের? শেষ যেবার এসেছিলাম মেয়ের হাত ধরে, তারপর দীর্ঘ এক দশকে এই টাকুয়ামেনন দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে; আমার জীবননদী বেয়েও। সেদিনের সেই ছোট্ট তুলতুলি আজ হাইস্কুলে পড়া টিন-এজার। তবু মাঝে মাঝে যখন আমার কাছে থাকে, অনর্গল হাত-পা নেড়ে বলে যেতে থাকে যত রাজ্যের জমা কথা – পড়াশোনার, বন্ধুবান্ধবের, এক্সট্রাকারিকুলার্সের – কোথায় যেন সেই বাবার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা আর আবদার করে কোলে চড়তে চাওয়া তুলতুলিকেই খুঁজে পাই। ইচ্ছে করে প্রতিটা মুহূর্ত ওকে আঁকড়ে থাকতে। কিন্তু না, তা আর সম্ভব নয়। ওকে যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রায়ের কাছেও সময় কাটাতে হবে। অন্ততঃ আইন তাই বলে। 'অক্টেভ স্কুল অফ মিউজিক' আর 'মেলোডিজ অন হুইলস' ট্রাভেলিং ব্যান্ডের দুই কর্ণধার নীলাভ্র আর পর্ণা রায় সপ্তাহের যে দিনগুলোয় কর্মব্যস্ত, শুধু তখনি আমার বাবা হওয়ার অধিকার। কয়েক বছর আগে, যখন ফাটল ধরতে শুরু করেছে কিন্তু ধ্বস তখনও নামেনি, শৈশব-অনুত্তীর্ণ মেয়েটা মায়ের আচরণে ক্রমপরিবর্তন আর মা-বাবার সম্পর্কের বরফ-শীতলতা দেখে এক গভীর অসহায়তাবোধে কান্নাকাটি করত। কিন্তু এখন ও বয়ঃসন্ধি পেরিয়েছে, নতুন চোখে দেখতে শিখেছে জীবনকে। স্কুলে পিয়ানো আর বেহালা শেখে, নিশ্চয়ই বোঝে অক্টেভে-অক্টেভে না মিললে যুগলবন্দী হয় না। অনেক যত্নে সুর-বাঁধা যন্ত্রও হঠাৎ হঠাৎ বেসুরো হয়ে যায়। আজও মনে পড়ে, সেই ছোট্টবেলায় টাকুয়ামেননে গিয়ে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা নীলহলুদ প্রজাপতি দেখে ও যখন বায়না করেছিল ধরে দিতে, বলেছিলাম ওদের ধরে রাখা যায় না রে সোনা। ওরা যার কাছে ধরা দিতে চায়, নিজেই উড়ে গিয়ে বসে তার গায়ে। জানি না সেদিন বিশ্বাস করেছিল কিনা আমার কথা। আজ হয়তো করে।

ধীরপায়ে বরফ মাড়িয়ে একটু একটু করে দূরে চলে যাই সেই রেলিংঘেরা জায়গাটা থেকে। পিছনে পড়ে থাকে স্মৃতির ক্ষতের মতো কিছু পদচিহ্ন। আর তুষারিত টাকুয়ামেননের মৌন-মুখরতা। হয়তো সে অপেক্ষায় আছে আমারই মতো – আগামী কোনো এক বসন্তের জন্য।

বাগবাজারের কথা

মালবিকা চ্যাটার্জী

বেশ কিছু বাজারযুক্ত নাম আমরা দেখতে পাই কলকাতায়। বাজার মানেই কেনাবেচা – কিন্তু পণ্য ছাড়াও এসব জায়গার বিভিন্ন মাহাত্ম্য লক্ষ্য করা যায়। শ্যামবাজার, শোভাবাজার, বৌবাজার, বড়বাজার, টেরিটিবাজার, রাজাবাজার, বাগবাজারে কিসের লেনদেন হতো সে কথা পরে হবে'খন। এত বাজারের মধ্যে বাগবাজারে আমার নজর আটকে গেল কেন বলতে পারব না; তবে মনে হয় ছোটবেলা থেকে বাগবাজারের সঙ্গে আমাদের বেশ ভালরকম যোগাযোগ ছিল, সেই কারণেই। বাগবাজার নামের মধ্যেই যেন মিশে আছে আভিজাত্য আর ইতিহাস।

ছোট বয়সে লেখাপড়ার জন্য যখন বোর্ডিং স্কুলে গেলাম, তখন নানা বিড়ম্বনার সঙ্গে আমার কোথায় বাড়ি বলার বিড়ম্বনাও ছিল। দূর দূরান্ত থেকে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসত ছেলেমেয়েরা। অন্য জায়গার কথা ছেড়ে দিই – কলকাতা থেকে যারা গিয়েছিল ওখানে, তাদের বেশিরভাগই দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ছিল। বেশ গালভরা আর আধুনিক তাদের বাড়ির জায়গার নামগুলো; সেক্ষেত্রে আমাদের (আমার বোনও পড়ত শান্তিনিকেতনে) বাড়ি প্রথমে দর্জিপাড়ায় তারপর নারকেলডাঙায়; দুটো জায়গার নামই মনে হতো বড়ই নিকৃষ্ট। দক্ষিণ কলকাতার মানুষ উত্তর কলকাতাকে কেমন যেন একটু অন্য চোখে দেখত। তখন মনেও হয়নি যে উত্তর কলকাতাই আদি কলকাতা, দক্ষিণ তো এসেছে অনেক পরে। কলকাতার বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ জায়গাগুলো উত্তর কলকাতাতেই, যেখানে ব্রিটিশরা এসে জাঁকিয়ে বসে ভারতের রাজধানী হিসেবে প্রথমে কলকাতাকেই বেছে নিয়েছিল; সেই সমগ্র কলকাতায় উত্তর দক্ষিণের ভাগাভাগি ছিল না তখনও। তারপর ব্রিটিশ আমল থেকে লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়েছে ওদিকগুলোয়। এই উত্তর কলকাতা থেকে বহু স্বদেশপ্রেমী দেশের স্বাধীনতার জন্ম দিয়ে নিজেদের নাম অমর করে রেখেছেন। স্বাধীনতার পর ভারত ভাগের সময় তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ অঞ্চল থেকে চলে আসা বাঙালিরা দলে দলে এসে পড়ায় কলকাতার আয়তনও বাড়তে থেকেছে। এর পর পাকিস্তান থেকে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে জন্ম নেবার পরে আবার অনেক বাঙালিরা চলে আসেন কলকাতায়। স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে পরিধি; উত্তর থেকে কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণে।

ফিরে আসি বাগবাজারের কথায়। বাগবাজার নামের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে দেখি বাগবাজারে 'পেরিন্স গার্ডেন' নামে একটি উদ্যান আছে; কলকাতার আদিযুগে সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমোদ প্রমোদের জন্য যেতেন বলে জানা যায়। উদ্যান অর্থাৎ বাগ, বাগ অর্থাৎ ফুল-ফলের বাগান – তাই জন্যই কি এমন নাম হয়েছিল জায়গাটির – "বাগবাজার"!

তবে ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন মনে করেন যে বাগবাজার শব্দটি 'বাঁক বাজার' শব্দের অপভ্রংশ; কারণ এই জায়গার কাছে হুগলি নদীর একটি বিরাট বাঁক আছে।

বাগবাজার উত্তর কলকাতার একটি অঞ্চল, যা শ্যামপুকুর থানার অধীনে পড়ে। বাগবাজার ও তার পাশে শ্যামবাজার – এই দুটি জায়গায় তখন বহু অভিজাত বাঙালি পরিবার বাস করতেন। এখনও ওসব জায়গায় পড়ন্ত বনেদিয়ানার আভাস পাওয়া যায়।

বাগবাজার একসময় ছিল সুতানুটি গ্রামের অংশ। এখানে বসবাস ছিল বসু ও পাল পরিবারের। বসু পরিবারের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, নন্দলাল বসু ব্রিটিশদের আমাদের দেশে আসার অনেক আগেই সুতানুটিতে এসেছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে বাগবাজারের কাছেই বিখ্যাত লালদীঘির যুদ্ধটি ঘটে। এই যুদ্ধে সিরাজ জয়লাভ করে কলকাতা অধিকার করেন এবং বাংলার নবাব হয়ে যান।

বাগবাজার অঞ্চলের উত্তরে বাগবাজার খাল, পূর্বে শ্যামবাজার, দক্ষিণে শোভাবাজার ও কুমারটুলি আর পুবদিকে বয়ে যাচ্ছে হুগলি নদী। পুরনো চিৎপুর রোড, এখন যার নাম রবীন্দ্র সরণি, বহুকাল ধরেই বাগবাজার অঞ্চলের জীবনরেখা। সার্বর্ণ রায়চৌধুরীর পরিকল্পনায় হালিশহর থেকে বেহালা পর্যন্ত টানা এই রাস্তা তৈরী হয়েছিল। ১৯০৪ সালে এই পথে বাগবাজার অবধি ট্রামলাইন টেনে আনা হয়।

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলায় গড়ে ওঠা অতি পুরনো রাস্তাগুলির মধ্যে বাগবাজার স্ট্রিট অন্যতম। এই রাস্তা শ্যামবাজার আর বাগবাজার জায়গাদুটিকে যুক্ত করে। ভোলা ময়রা, স্বনামধন্য কবিয়াল এই বাগবাজার স্ট্রিটের মিষ্টান্ন বিক্রেতা

ছিলেন | বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় বারোয়ারি দুর্গাপূজা | এই পূজাটিও বাগবাজার স্ট্রিটেই অনুষ্ঠিত হয় | বাগবাজার অঞ্চলে অনেক অলিগলি আছে | এখানের একটি প্রাচীন গলি – বোসপাড়া লেন |

বাগবাজারের রাস্তাগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফেটেরিয়ার জন্যও বিখ্যাত | এখানে একটা অদ্ভুত জায়গা আছে – গিরিশ অ্যাভেনিউ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউর একটি প্রসারিত অংশ | ১৯৩০ দশকে এই রাস্তাটি তৈরী করার সময় দেখা যায় পথের মাঝে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাসভবনটি পড়ছে; এক্ষেত্রে বাড়ির অংশ দুপাশ থেকে একটু কমিয়ে নিয়ে, রাস্তাটিকে দু'ভাগে ভাগ করে বাড়িটির দুপাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় | এখনও বাগানসহ বাড়িটি রাস্তার ঠিক

মধ্যিখানেই রয়েছে |

বাগবাজারের ৮ নং কাঁটাপুকুর বাইলেনে বাস করতেন নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮)| এখানেই তিনি 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন | কলকাতা পৌরসংস্থা তাঁর সম্মানে এই রাস্তাটি 'বিশ্বকোষ লেন' নামে উৎসর্গ করেছে | সম্ভবত এটাই পৃথিবীর একমাত্র বইয়ের নামে রাস্তা |

বাগবাজারে চক্ররেলের একটি স্টেশন আছে |

কলকাতার ক্রমবিকাশে বাগবাজারের ভূমিকা অনেক | জায়গাটি তার ঘাট, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের জন্য বিখ্যাত | এখানে জনপ্রিয় জায়গাগুলির মধ্যে ব্যোমকালী মন্দির, মদনমোহন মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বলরাম মন্দির; যা বলরাম বসুর বাসভবন এবং বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, পুঁটেকালী মন্দির, মায়ের ঘাট, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন দ্বারা পরিচালিত সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ভগিনী নিবেদিতার বাসভবন; এখানেই তাঁর স্কুলের যাত্রা শুরু হয় | বাগবাজারে মায়ের বাড়ি ও উদ্বোধন কার্যালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এছাড়া বাগবাজার স্ট্রিটে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ, গিরিশ মঞ্চ এবং পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমি ও ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চ এসবই বাগবাজারের অঙ্গ | বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরিটি শহরের অন্যতম প্রাচীন লাইব্রেরী |

কলকাতার একজন প্রভাবশালী জমিদার, যিনি 'ব্ল্যাক জমিদার' নামে পরিচিত, গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র রঘু মিত্র, ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির শাসনকালেই বাগবাজারের বিখ্যাত 'বাগবাজার ঘাট'টি তৈরী করান | বাংলা সাহিত্যে এই অঞ্চলের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় | বিশেষ করে 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে প্যারীচাঁদ মিত্র বাগবাজার ঘাটে স্নানরতা মেয়েদের কথোপকথনের একটি খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন |

অনেক বিশিষ্ট মানুষজন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার), বলরাম বসু (শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত), মোহনচাঁদ বসু (নিধুবাবুর শিষ্য, যিনি বাংলা আখড়াই গানে খেউড় উদ্ভাবন করেন), ভোলা ময়রা, ভগিনী নিবেদিতা, নগেন্দ্রনাথ বসু, হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, গদাধর ঘটক প্রমুখ আরো অনেকে বাগবাজারে বাস করতেন |

উনবিংশ শতাব্দীতে যে অসাধারণ মানুষটির সঙ্গে বাগবাজারের নাম ওতপ্রতোভাবে জড়িয়ে পড়ে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ | সম্ভবত ১৮৭৭ সালে প্রথমবার তিনি বাগবাজারে গিয়েছিলেন ৪০, বোসপাড়া লেনে (বর্তমান নাম মা সারদামণি সরণি) কালীনাথ বসুর বাড়িতে | সেখানেই হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ), গদাধর ঘটক (গঙ্গোপাধ্যায়)

(পরবর্তীকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ) ও প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

১৮৯৯ সালে 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দ প্রকাশ করেন। আজও সেই পত্রিকা স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়ে

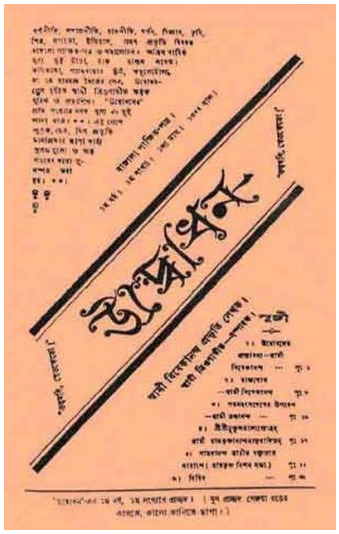

উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা

চলেছে। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা মহারাজ)। রামকৃষ্ণ ভক্তসমাজ এই অঞ্চলের প্রতি ক্রমাগত বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন। ফলে পরবর্তীকালে এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্বোধন কার্যালয় গড়ে ওঠে বাগবাজারে। ১৯০৭ সালে তৎকালীন সম্পাদক শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) উদ্যোগে পত্রিকার জন্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের জননী, সারদা দেবীর কলকাতায় বসবাসের সুবিধার জন্য মিশন থেকে বাগবাজারে একটি তিনতলা বাড়ি তৈরী করানো হয়। এই বাড়ির এক অংশ ব্যবহার হতো সারদা দেবীর কলকাতা বাসভবন হিসেবে। এই বাড়িটিই 'মায়ের বাড়ি' নামে পরিচিত এবং মিশনের 'উদ্বোধন'-এর কার্যালয়।

পরে বাড়ির সামনে রাস্তাটির নাম মুখার্জ্জী লেন থেকে বদলে 'উদ্বোধন লেন' করা হয়েছে।

এই বাড়ির একদিকে কাশী মিত্র শ্মশানঘাট ও শ্মশানেশ্বর শিব মন্দির আছে।

উদ্বোধন বাটীতে মা সারদা দেবী

বাগবাজারে আমাদের সবথেকে বেশি যাবার জায়গা ছিল এই উদ্বোধন, যা 'মায়ের বাড়ি' বলেও চেনেন সকলে। আমাদের মা-বাবা ছিল রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত, তাই সুযোগ পেলেই চলে যেত মায়ের বাড়িতে। ছুটির সময় বাড়িতে থাকলে আমরাও সঙ্গে যেতাম। খুব ভাল লাগত ওখানে যেতে। বাড়ির মাঝখানে উঠোন ঘিরে কয়েকটি ঘর। মায়ের ঘর দুতলায়। সেখানে আমরা গিয়ে বসতাম। মা-বাবা অনেকক্ষণ জপ-ধ্যান করত; আমরা দু'বোন উসখুস করতাম, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতাম, কিন্তু ভালও লাগত।

এখন সেই উদ্বোধন কার্যালয় এদিকে ওদিকে অনেকটা বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে; পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম সেসব জায়গায় সারা হয়। মায়ের বাড়িটি এখন কেবল ভক্তদের আনাগোনার জন্য।

বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল ১৯১৮ সালে। ছোট-বেলায় আমরা মা-বাবার সঙ্গে যেতাম বাগবাজারের সেই বিখ্যাত ডাকের সাজের দুর্গাপুজো দেখতে, যেতাম বাগবাজারের নামকরা রেস্টুরেন্টগুলোয়।

এভাবেই আমার হৃদয়ে বাগবাজার একটা বিরাট সুখস্মৃতিপূর্ণ অংশ দখল করে রয়েছে।

মলাট

অযান্ত্রিক

লুঙ্গি আর জামাপরা ইলিয়াস এবং গোলাম বেশ চিন্তিতভাবে পায়চারি করে চলেছে নসীবপুর হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বাইরেটায়।

কী ভেবে গোলাম বলে উঠল, "ইলিয়াস, আচ্ছা রকমের বেয়াকুব আছ কিন্তু তুমি। এতটা বোকামি করা আমাদের ঠিক হয়নি?"

- "কিন্তু ভাইজান, আমি তো বলেই ছিলাম, ছেড়ে দাও। পুলিশ তো ঘুরছেই, দেখলে নিজেরাই নিয়ে যাবে। আমরা নিয়ে গেলে শেষমেষ আমাদেরকেই জড়িয়ে দেবে; কিন্তু ওই যে, জুমার নামাজের পর কোন ভাল মানুষের জ্বীন যে তোমার উপর ভর করে কে জানে! কিছু শুনলে না, নাও এবার ভোগো," বেশ বিরক্ত হয়েই বলল ইলিয়াস।

- "আরে না না, আমি সে কথা বলছি না। সব কিছুতেই উল্টো বোঝাটা তোমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি কি – মানুষটার পকেট-টকেট খুঁজে মোবাইলখানা পেলে ওঁর বাড়ির লোককে তো খবর দেওয়া যেত; নাহলে আমাদের সারারাত এখানেই বসে থাকতে হবে। আর আল্লাহ না করুন, যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তখন?"

গোলাম কথাটা শেষ করতেই দেখা গেল করিডোর দিয়ে একজন পুলিশ অফিসার ওদের দিকেই এগিয়ে আসছেন, সাথে একজন নার্স।

ওঁরা কাছে আসতে গোলাম কিছু একটু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অফিসারের সাথে আসা নার্সটি গোলাম আর ইলিয়াসকে দেখিয়ে বললেন, "এই যে স্যার, এঁরাই চিন্ময়বাবুকে হাসপাতালে এনেছেন। আমি এঁদের এখানে অপেক্ষা করতে বলে আপনাকে খবর দিয়েছিলাম।"

অফিসার খুব সন্দেহের দৃষ্টিতে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

গোলাম নার্সটিকে বলল, "ও আচ্ছা, ওঁর নাম তাহলে চিন্ময়; ভাল ভাল, আল্লাহ আপনার ভাল করুন। ওঁর বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই?"

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক কড়া নজরে দেখছিলেন গোলাম আর ইলিয়াসকে। ইলিয়াস বছর কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে হবে, আর গোলাম প্রায় পঞ্চাশ, তবে দুজনের শরীর-স্বাস্থ্য যথেষ্ট শক্তপোক্ত।

- "সে তো দিয়েছিই, কাছেই থাকেন, এসেও পড়বেন সবাই এক্ষুনি। সে ব্যাপারে অবশ্য আপনাদের না ভাবলেও চলবে। আগে বলুন দেখি, আপনারা ওঁকে পেলেন কোথায়? আর আপনাদের পরিচয়ই বা কী?" বেশ মেজাজের মাথায় বললেন অফিসার বিকাশ মুখার্জী।

- "সে তো বুঝলেন কিনা, আমি আর ইল্লি দোকান বন্ধ করি ঘর যাচ্ছিলাম। হাইরোডে উটতি দেখি ঝোঁপের মদ্ধি ওই বাবু চিত্তির দিয়ে পইরে আছেন; সারা শরীর অক্তে ভেইসে যেচ্ছে। তাই তো ধরা কইরে ভ্যানে তুইলয়ে হাসপাতালে থুইলাম," মুখে বেশ একটা তৃপ্তির হাসি দিয়ে গুছিয়েই কথাটা বলল গোলাম।

- "সে তো বুঝলাম। কিন্তু তোমরা কে? আর অত রাতে হাইরোডে ভ্যান নিয়ে কী করছিলে?" স্বরটা একটু চড়িয়েই বললেন বিকাশবাবু।

- "সে আমার নাম হ'ল গিয়ে গোলাম মোক্তার। ওই নসীবপুর হাটে আমার ফলের দোকান আছে। আর ওরে দেখছেন, ও হ'ল গিয়ে ইল্লি, মানে ইলিয়াস পাশা। আমরা এক গেরামেই থাকি, মোক্তারপুরে। তা দোকান বন্ধ করে ফিরতি ছিলাম গো সার, তো পথে দেখি..." গোলাম বলেই চলছিল, কিন্তু বিকাশবাবু হাত তুলে তাকে থামতে নির্দেশ করতেই চুপ করে গেল।

- "ফলের দোকান? চ্যাংড়ামো হচ্ছে? এত রাতে কোন ফলের দোকান খোলা থাকে শুনি? সত্যি করে বল, নাহলে দুটোকে এক্ষুনি চালান করব। আর রাতে পুলিশ পেট্রলিং থাকে, তাদের কারো চোখে পড়ল না, তোদেরই চোখে পড়ল? নাকি মেরে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য হাসপাতালে নিয়ে এসে নাটক করছিস?" বেশ রেগে, জেরা করার ভঙ্গিতে বললেন বিকাশ মুখার্জী।

- "দেখলে ভাইজান, আমি তোমাকে বলেছিলাম এঁকে নিয়ে গেলে পুলিশ আমাদেরকেই ধরে টানাটানি করবে!" বেশ কাতর স্বরে বলল ইলিয়াস।

- "আরে, দাঁড়া না। সার এর কোনো দোষ নাই। লোকে তো সেটাই ভাববে, তবে সার আপনি অনাকেই জিগাইলে সব জলের মতো পষ্কার হয়ে যাবে, আমরা কিছু করিনি। কিন্তু অসুস্থ

মানুষকে হাসপাতালে আনা যদি দোষ হয়, তয় দ্যান চালান করে দ্যান | বাকি রইল দোকান, এই সময় বাবার থানে জল ঢালতি অনেক জলযাত্রী আসেন, তাদের ফল জল দেয়ার জন্যি আমরা একটু বেশী রাত অবধি থাকি, আল্লাতালা বলেছেন সেবা করলে জন্নত নসীব হয়, তাই করি;" একটু নিরাশ হয়েই বলল গোলাম মোক্তার|

- "ভাল কথায় জানতে চাইলাম, বললি না তো? চল, এবার থানায় নিয়ে গিয়ে তোদের জন্নত নসীব করাচ্ছি|"

এই বলে বিকাশবাবু ইলিয়াস আর গোলামের হাত জোর করে ধরে এগোতে যাবেন, ঠিক তখনই একজন ভদ্রমহিলা সাথে একজন নার্স আর একটা বছর পনেরোর বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে | এসেই বিকাশবাবুকে দেখে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আচ্ছা অফিসার বিকাশ মুখার্জী কোথায় আছেন বলতে পারেন? আমার স্বামী চিন্ময় ভট্টাচার্যকে এই এমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হয়েছে, ওঁকে এক্ষুনি রক্ত দিতে হবে, নাহলে বাঁচবেন না| এঁদের কাছে রক্ত নেই|"

- "শান্ত হন, শান্ত হন| আমি বিকাশ মুখার্জী| আপনি কি স্বাতী মুখার্জী? শান্ত হন, আমি দেখছি কী করা যায়!" বললেন বিকাশবাবু|

- "কিন্তু স্যার যাই করুন, আধঘন্টার মধ্যে করুন | এর থেকে বেশী সময় নিলে পেশেন্টকে বাঁচানো যাবে না," জানালেন সঙ্গে আসা নার্সটি|

গোলাম আর ইলিয়াস মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল | বিকাশবাবু হাত ঘড়িতে দেখলেন প্রায় রাত তিনটে বাজে| কোথায় পাবেন এখন রক্ত? শেওড়াফুলি কিংবা চুঁচুড়া থেকে আনতে গেলেও ঘন্টা খানেক তো লাগবেই!

গোলাম মোক্তার হঠাৎ জামার হাতা গুটিয়ে নার্সের সামনে এসে বললে, "দ্যাহেন দেকি আমার অক্তো চলতি পারে কিনা| যদি হয়, নে ন্যান দিকিনি, মানুষটা তো আগে বাঁচুক; তারপর দ্যাখব অনে জেল হাজত কী হয়| ভয় নাই সার পালাব না|"

নার্স ভদ্রমহিলা একটু হকচকিয়ে তাকিয়ে আছেন দেখে গোলাম আবার বলল, "আরে আপা, উপরওয়ালা নিজেই হিন্দু আর মোসলমানের অক্তে ফারাক করেননি, তো আমরা করার কে? বুঝলেন কিনা সার, আমি ওনারে অক্ত থুইয়ে আসি তারপর না হয় যাব অনে আপনার লগে | কী দিদি আপনার কুনো অসুবিধে নাই তো?" বলে নার্সের সঙ্গে ভিতরে চলে গেল গোলাম মোক্তার|

ভোর হয়েছে| সকালের আলোয় পৃথিবীটা আজ বেশ অন্যরকম লাগছে ইন্সপেক্টর বিকাশ মুখার্জীর | হাসপাতালের সামনে চায়ের দোকানে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "গোলামবাবু দেখুন নতুন সূর্য উঠছে, কী ভাল লাগছে, তাই না?"

- "না সার, এই সূর্যটাই রোজ ওঠে; আজ হয়তো আপনার চোখের দৃষ্টিটা বদলে গেছে, তাই নতুন লাগতেছে| ওরে ইল্লি, চল দিকিনি ঘরকে চল, অদিকে সকালের নামাজের সময় হয়ে গেল যে! আসি সার, আপায় কইবেন দুপুর দিকে পারলি পরে একবার আসব অনে চিন্ময়বাবুরে দেখতি|"

বিকাশবাবু দেখলেন একটা ভাঙা ভ্যান-রিক্সায় চড়ে ওরা দুজন চলে যাচ্ছে| সত্যি, সাদাসিধে মানুষটা কত সহজে এতগুলো বড় কথা বলে গেল – ঈশ্বর মানুষ বানানোর সময় তো ফারাক করেননি, মানুষই মানুষের ফারাক করেছে| আর... এই সূর্যটাই রোজ ওঠে, কেবল দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে|

সত্যি, মলাট দেখে বই বিচার করার অভ্যেসটা একেবারেই ঠিক নয়!

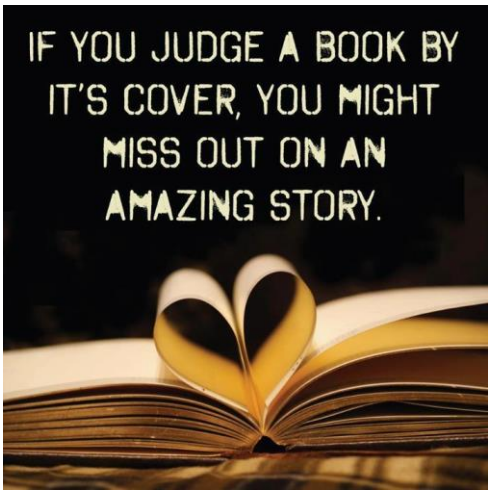

শ্রী নারায়ণ সাউ

রুমকি দাশগুপ্ত

গল্পের চরিত্রগুলো অতি সাধারণ | কত্তাবাবু, গিন্নীমা, ঠাকমা, ছোটকা, দাদা, দিদি, ও ডেভিল নামক একটি আদরে-মাথা-খাওয়া অ্যালসেশিয়ান | বড় রাস্তার এক পাশে চব্বিশ ঘন্টা কলকাতা পৌরসভার জলের সরবরাহ | বড় রাস্তাটা পার হলেই ওদিকে মিউনিসিপ্যালিটির জলের লাইন | জল কখনো আছে তো কখনও নেই | সময়েরও কোনো ঠিকঠিকানা নেই যে কলে জল এলে তারা জল ধরে রাখবে | আর ধরে রেখেও যে খুব সুবিধা হয়, তাও নয় | লাল রঙ আর বিচ্ছিরি স্বাদের এই জলে সাদা জামাকাপড় কাচলে লালচে একটা বর্ণ দাঁড়ায় | স্কুলে, অফিসে সেই জামাকাপড় পরে যাওয়া যায় না | এ জলে ডাল সিদ্ধ হয় না; বড়ই ঝামেলা | তাই বড় রাস্তার এধারে বেশিরভাগ বাড়িতেই কুয়ো আছে | কুয়োর গভীরত্বের উপর নির্ভর করে জল কত মিষ্টি বা ভাল হয় | কত্তাবাবু কোন জিনিসই খারাপ করেন না | সামর্থের বাইরে হলে বাদ দিয়ে দেন; কিন্তু প্রয়োজনে সামর্থাতীত ভালটাই করার চেষ্টা করেন | ওঁর বাড়ির কুয়োটাও তাই গভীর | জল মিষ্টি, স্বচ্ছ ও ঠান্ডা | কুয়োর থেকে পাইপ গেছে বাথরুমের চৌবাচ্চায়, তাতে টিউবওয়েলের মতো হাত কল লাগানো, টিপলেই চৌবাচ্চা ভরবে | তখনকার দিনে এভাবে খুব কম লোক ভাবত | কত্তাবাবু এই বুদ্ধিটা বের করতে পেরে বড় খুশি; কিন্তু তবুও কত্তাবাবুদের বাড়িতে আরো নানারকম কাজ বাবদ পৌরসভার জল খানিকটা লাগেই |

এই এলাকায় প্রচুর মেদিনীপুরের ছেলেছোকরা এসে জুটেছে | বেশিরভাগই ভারির কাজ করে | কত্তাবাবুদের বাড়ি জল দিতে আসে জগন্নাথ-ভারি | ২৫/২৬ বছরের ছেলে | সকাল আটটায় ঢোকে, দু'ভার বা চার ড্রাম পৌরসভার জল এনে দেয়, তারপর বাড়ির সবাই বেরিয়ে গেলে চৌবাচ্চা পরিষ্কার করে তাতে জল ভর্তি করে | কাজের শেষে গিন্নীমা বা ঠাকমা তাকে খালি মুখে যেতে দেয় না | গরম রুটি, এক বাটি ডাল বা তরকারি আর গুড় তার বরাদ্দ | সঙ্গে এক কাপ গরম চাও থাকে | এটা ওর উপরি পাওনা | রান্নাঘরের দোরে বসে খেতে খেতে ঠাকমার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প – ওই খেতে যতক্ষণ লাগে আরকি। তারপর তো আবার বেলা দুটো আড়াইটে অবধি লোকের বাড়ি জল দেওয়া | ফেরার পথে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে ঘরে গিয়ে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেয় | ভারি-মহলে জগন্নাথকে একটু হিংসেই করে সবাই | সকালে শুকনো মুড়ি চিবোতে হয় না তাকে, পেট পুরে গরম রুটি খায় সে |

গল্পের মাধ্যমে ঠাকমা তার গ্রামের বাড়ির অনেক খবরই জেনেছেন | জেনেছেন জগন্নাথের বাড়িতে আছে মা-বাবা, বৌ, দুটি বাচ্চা, বিবাহযোগ্য তিনটি বোন ও একটি ভাই | ভাইয়ের একটা কাজ হলে ভাল হয়, কিন্তু ও ছোট, জল বইতে পারবে না | তাই ওকে কলকাতায় আনেনি এখনও জগন্নাথ | যত দিন যায় ঠাকমার সঙ্গে জগন্নাথের গল্প তত জমে ওঠে |

একদিন কথায় কথায় ঠাকমা তাকে বললেন, "ছেলে-বৌয়ের সঙ্গে কথা বলেছি; তোর ভাইকে আমাদের বাড়ি রাখবি? ভারী কাজের লোক যা আছে তা থাকবে, এই হাতে হাতে ফরমাশ খাটার জন্য? তাহলে বৌমারও খাটুনি একটু কমে |" জগন্নাথ যেন হাতে স্বর্গ পেল | এক কথায় সে রাজি | গ্রাম থেকে রোজই লোকজন যাওয়া-আসা করে, বাড়িতে খবর পাঠালো সে | বড় ছেলে, রোজগার করে সংসার চালায়, সব দিকে নজর তার | সে বললে মা বাবা আপত্তি করবে কেন!

মাস খানেকের মধ্যেই এক কাপড়ে (কোমরে দড়িবাঁধা প্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে) ভাইটি এসে উপস্থিত | সেদিন রাতে ভাইকে আদর করে মাছ ভাত খাইয়ে অনেক বোঝাল জগন্নাথ | কত্তাবাবুরা মানুষ বড় ভাল | কথা শুনে চললেই হবে | গিন্নীমা যেমন যেমন শেখাবেন, কাজকর্ম সেরকম চটপট শিখে নিতে হবে | ব্যস, আর চিন্তা কীসের? তার সঙ্গেও রোজ দেখা হবে | সে তো ও বাড়িতে জল দিতে রোজই যায় |

পরের দিন সকালে ভাইকে স্নান করিয়ে, তাকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ-ভারি পৌঁছে গেল কত্তাবাবুদের বাড়িতে | বাড়ির সবাই ভিড় করে এসে দাঁড়াল | ঠাকমা চালশেপড়া চোখে মাথাটা ওপর-নিচ করে প্রথম প্রশ্নটা করলেন, "নাম কি তোর?" খোলা উঁচু গলায় উত্তর এল, "শ্রী নারায়ণ সাউ, বয়স চৌদ্দ বৎসর |" শ্রী নারায়ণ সাউকে দেখলে যদিও ১৪ বছরের মনে হয় না | পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই হয়তো তাকে ১০-১১ বছরের বেশি বলে মনে হয় না | ফর্সা, ছোটখাটো, খেঁদা নাকের, হাসিখুশি শ্রী নারায়ণ সাউ কলকাতায় তার মা-বাবুর বাড়িতে 'নারাণ' নামে পরিচিত হয়ে গেল | মুখটা বড় মায়াবী তার |

প্রথমেই নারাণের মাথা পরীক্ষা করল ঠাকমা; নাহ, উকুন নেই, বিরাট রক্ষা! স্নান করে আসা সত্ত্বেও ঠাকমা তাকে কুয়ো পাড়ে নিয়ে গিয়ে সাবান ঘষে স্নান করালো। তার নতুন গামছা হ'ল।

- "এ সাবানে কী ভাল গন্ধ রে ঠাকমা! আমায় রোজ দিবি তো?"

গিন্নীমার কাজ একটু বাড়ল। সেদিন দুপুরে গিন্নীমা না গড়িয়ে, নারাণের জন্য দুটো প্যান্ট আর ফতুয়া সেলাই করলেন। দু-দুটো নতুন জামা-প্যান্ট পেয়ে বেজায় খুশি নারাণ। বললে, "তুই বড় ভাল রে মা।" ওঁদের ছোট সংসারে যোগ হ'ল নারাণ। কোনো আড়ষ্টতা নেই নারাণের। সরল ভালবাসায় আপন হয়ে উঠল দাদা, দিদি ও ডেভিলের কাছে। মা'র কাছে চা করতে শিখল। কথার শেষ নেই তার। মা বাদে সবাই বাজে। কথা বললেই বলে, "মেলা বকিস না, থাম।" নারাণ তাও বকে যায়।

- "ওরেব্বাস মা, রোজ দুপুরে মাছ দিবি আমায়? তুই বড় ভাল রে। ঠাকমা, তুই মাছ পাস না কেনে রে? তোরটা বুঝি মা আমাকে দেয়? মা, ওমা, মোর মাছের অর্ধেকটা ঠাকমাকে দিস কাল থেকে।"

ভাই মানিয়ে নিয়েছে দেখে জগন্নাথ নিশ্চিন্ত, তাছাড়া দেশে একটা পেট কমল; উপরন্তু মাস গেলে নারাণের মাইনে বাবদ হাতে কষকষে ২৫টা টাকা বেশি আসছে।

নারাণকে নিয়ে গিন্নীমা মণিহারি দোকানে, মুদির দোকানে, ডিমওয়ালা, কলাওয়ালী, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বলে দিলেন তাদের কাছে ফর্দ পাঠালে তারা যেন নারাণের হাতে জিনিস দিয়ে দেয়। গিন্নীমারা এ পাড়ায় বহুদিনের, তাই একবাক্যে নিয়ম চালু হয়ে গেল। নারাণ নিরক্ষর; ও জানে না যে ফর্দে জিনিসের পাশে দাম লিখে তারই হাতে সেই ফর্দ গিন্নীমার কাছে ফেরৎ পাঠায় দোকানিরা। গিন্নীমা দেখেন প্রায়ই কুড়ি পয়সা কম। ব্যাপারটা কয়েকবার লক্ষ্য করার পর নারাণকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, তুই পয়সা দিয়ে কী করিস? দোকানি যা লিখে দেয় তার থেকে কম দিস কেন? ফেরার পথে পয়সা হাত থেকে পড়ে যায় না তো?" সোজা উত্তর, "আমারে কি উল্লু পাইছিস মা তুই? পয়সা দামি জিনিস নারাণ তা জানে। পয়সা ফেলি না রে, ওই মণিহারি কাকুর দোকানের পাশে যে মিঠাইয়ের দোকানটা আছে, ওখান থেকে গোল্লা খাই। ও মিঠাইওয়ালা বড় বদ, আগে পয়সা নেবে, তবে মিঠাই দিবে। আমি কি পয়সা না দিয়া পলাইব? আমার মা'র বদনাম হবেক নাই? কেন রে মা, আজ কি আমায় ঠকায়ে বেশি পয়সা নিছে?"

গোল্লা মানে রসগোল্লা, দেখে নারাণের বড় লোভ হয়, তাই ও খায়। নারাণকে তখন বোঝানো হ'ল নিজে অমন কিনে খেলে চলবে না। মাকে বলতে হবে, মা কিনে খাওয়াবে। ব্যাপারটা ভাল না লাগলেও মেনে নিল নারাণ। শহুরে জলের ছিটে পড়ল ওর ছোট মনে।

সেটা ৭০ সাল। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে গঙ্গা, ভেসে গেছে বাবুদের পুকুরটাও। মাঠঘাট জলে থৈ থৈ। বেশিরভাগ বাড়ির একতলায় জল ঢুকে গেছে। বাবুদের বাড়িতে শুধু সিঁড়ির তলায় জল। একতলাটা একটু উঁচু হওয়ায় ঘরগুলো শুকনোই ছিল। ক'দিন ধরে সকালে নারাণকে দুধ আনতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, যদি জলে ডুবে যায়! বাবু দুধ নিয়ে আসছেন। ও গ্রামের ছেলে, সাঁতরে দুধ এনে দেবে – রাগ হয়, কিন্তু দাদা-দিদির মতো সেও বাবুকে ভয় করতে শিখেছে। মা হলে একপ্রস্ত ঝগড়া করা যেত।

একদিন সবাই মিলে বিয়ের ভোজ খেতে গেল। এমনকি ছোটকাও। বাড়িতে পড়ে রইল ঠাকমা, নারাণ আর ডেভিল। সেদিন বড় রাগ হ'ল নারাণের। ওর বুঝি ভোজ খেতে ইচ্ছা করে না? বলেওছিল মাকে, কিন্তু লাভ হ'ল না। মা বললে, "তোর তো নেমন্তন্ন নেই। তুই আসার আগে বলে গেছে ভোজের কথা। তোকে নেওয়া যাবে নারে, পরের বার যাস।" নারাণ মাকে আর কিছু বলেনি, কিন্তু ওর রাগও পড়েনি।

বেরোবার সময় মা ঠাকমাকে বলে গেল ওরা বেরোলে বাইরের দরজাগুলোতে তালা দিয়ে দিতে। খোলা মাঠের মধ্যে দূরে দূরে বাড়ি, একা বৃদ্ধা বাড়িতে থাকবেন, এইসব ভেবে আরকি। রাতে বাইরের দরজাগুলোতে এমনিতেও তালা পড়ে। তালার দুটো চাবি ছিল। তার একটা গিন্নীমা সঙ্গে নিলেন, যাতে রাতে এসে কারো ঘুম ভাঙাতে না হয়।

এই তালাচাবির আলোচনার সময়ই নারাণের মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল। ব্যস, ওর মাথা ঠান্ডা। রোজকার মতো আজ ঠাকমা বুড়ি আহ্নিকে বসে ঝিমোতে শুরু করুক, সে তখনই তাকে ভোজে না নিয়ে যাওয়ার শোধ তুলবে। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। ঠাকমা তালা দিয়ে, বালিশের তলায় চাবি রেখে, আহ্নিকে বসে যেই ঝিমোতে শুরু করেছেন, নারাণ হুট করে বুড়ির

বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে চাবিটা নিয়ে সোজা খাওয়ার ঘরে হাজির। তারপর বিশাল জানালা দিয়ে চাবির গোছা গুলির মতো বেগে জল থৈ থৈ মাঠে টপ করে পড়ে ডুবে গেল। আলো আঁধারিতে নারাণ দেখতে পেল চাবির গোছা ঠিক কোথায় গিয়ে পড়ল। ও মনে মনে ভাবল, ব্যস, খুব হইয়েছে এবার, আমায় না নিয়ে ভোজে যাওয়া!

যাইহোক, পরের দিন সকালে ঠিক জায়গায় চাবির গোছাটা রেখে দেবেন বলে ঠাকমা বালিশের তলায় চাবি দেখতে পেল না। বিছানা ওলোট পালট করা হ'ল। কোথাও চাবি নেই। খানিকক্ষণ মজা দেখার পর নারাণ ধরা পড়ল। হয়তো সরল মনে নিজেই বলে দিয়েছিল, ঠিক জানা নেই। তখন আরম্ভ হ'ল ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, ভয় দেখানো, কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু লাভ হ'ল না। মুখে তার একটাই কথা – "আমারে ভোজে নিস নাই, রাগ হইল, তাই এই বোরো জেনোলা দিয়ে সেই হোথা চাবি ফিককে দিছি।"

কেউ নারাণকে বিশ্বাস করল না। কত্তাবাবু বললেন, "তোমরা প্রথম থেকেই জগন্নাথকে বড্ড বেশি মাথায় তুলেছ। পাড়াভর্তি ওদের গ্রামের ছেলে। নারাণ যদি ওদের সঙ্গে কাজ করে? ওরাই তো ওর আপনজন। যদি ওদের চাবি দিয়ে থাকে, তাহলে তো নির্ঘাৎ বাড়িতে ডাকাতি হবে।" উনি আর ঝুঁকি নিলেন না। নারাণকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলেন। ওখানে কত্তাবাবুকে সবাই চেনে। একেবারে আসুন স্যার, বসুন স্যার, ব্যাপার! থানার ও.সি ততক্ষণে কত্তাবাবুর মুখে সব শুনে নারাণকে নিজের টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। হাঁটুর ভাজে রুল। নারাণ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। থানার বড়বাবু কত্তাবাবুকে কেস লিখতে বললেন। কেস লেখা শেষ হ'ল না, ভয়ে নারাণের প্যান্ট ভিজে গেল। কত্তাবাবুর মন গলল, খুব কষ্ট হ'ল ছেলেটার জন্য। উনি কেস বাতিল করে নারাণসহ বাড়ি ফিরলেন। তবে আজ নারাণ ঘুমোবে কত্তাবাবুর ঘরে। ঠাকমার ঘরে নয়। কত্তাবাবুর চোখে চোখে থাকবে সে।

পরেরদিন ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই জগন্নাথ বাড়ির বাইরে থেকে "মা, কত্তাবাবু" বলে হাঁকডাক জুড়ে দিল। বাড়ির সবাই ভাবল যে ওর ভাইকে কাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এ তারই ফল। ওরা সবাই বোধহয় এসেছে এ বাড়িতে চড়াও হতে। যাক, কিছু কথাবার্তার পর দরজা খুলে দেখা গেল জগন্নাথ একা, হাতে বেজায় বড় এক বাঁশের লাঠি। সে আজ নারাণকে পেটাবে। তাকে ভরসা করে কত্তাবাবুরা তার ভাইকে বাড়িতে ঠাঁই দিল, আর সেই ভাই তার নাম খারাপ করল! এ পাড়াতেই বাস তার, সবই শুনেছে সে। অনেক কষ্টে তাকে রোখা হ'ল। যতক্ষণ জগন্নাথ হম্বিতম্বি করল, নারাণ মা'র আঁচলটা ধরে মা'র পিছনে লুকিয়ে রইল। পরবর্তীতে এটাই ওর লুকোবার অন্যতম জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওটাই সবথেকে নিরাপদ জায়গা, যেখানে থাকলে কারোর কিছু করার ক্ষমতা হতো না; বাবুরও নয়।

মাথা ঠান্ডা হলে চা রুটি খেয়ে, পরে জল নিয়ে আসবে বলে জগন্নাথ বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় নারাণকে বলে গেল, জল কমলে সে আসবে। নারাণ যেন চাবি খুঁজে দেওয়ার জন্য তৈরী থাকে, নইলে তখন তাকে পেটাবে।

এর মধ্যে ও বাড়িতে নতুন তালাচাবি কেনা হয়েছে সব দরজার জন্য। নারাণ চুপিচুপি মাকে বলেছিল, "কিনিসনে কেনে, বলছি তো খুঁজে দেব।" দিন দশ পরে জল নামলে, জগন্নাথ-ভারি কান ধরে ভাইকে মাঠে নিয়ে গেল। হাঁটু অবধি কাদামাটি মেখে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নারাণ চাবি উদ্ধার করে ফেলল। মাঠ থেকেই উল্লসিত চিৎকার, "এই মা, দেখ কেনে পেইয়ে গেছি। শুধাই তুই নতুন তালা কিনে পয়সা উরাইলি।"

স্মৃতিটুকু থাক

বীরেশ্বর মিত্র

সে ছিল এক সুপুরুষ সদ্য যুবক, বয়স একুশ। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের একটি নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতী ছাত্র। আর অন্যজন ছিল হালকা হলুদ রঙের শাড়িপরা এক তন্বী।

দুজনেরই গন্তব্য দিল্লি। ছেলেটি দিল্লি যাচ্ছিল একটা বড় কম্পানিতে ফাইনাল ইয়ার সামার ট্রেনিং-এ। আগামী বছর সে পাশ করবে।

রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ার একটু পরে মেয়েটি তার জায়গায় এসে বসল, ঘটনাচক্রে একেবারে ছেলেটির মুখোমুখি। একাই যাচ্ছে। সঙ্গে একটা দামী চামড়ার সুটকেস। ঐ বয়সী ছেলেদের যা হয়, ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে রাজা উজির মারবে, কিন্তু কোন সুন্দরী মেয়ের সামনে পড়লে একেবারে জুজু।

তবে এক্ষেত্রে একটা ছোট তফাৎ দেখা গেল। মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরী এবং কম বয়সী হলেও বেশ সপ্রতিভ। হয়তো দিল্লির মেয়ে বলে। সে-ই প্রথম 'হ্যালো' বলল বর্ধমানের কাছাকাছি গিয়ে, ঠিক যখন বেয়ারা চা-টা দিয়ে গেল।

ছেলেটির আর কোন লজ্জা বা আড়ষ্টতা রইল না। এমনিতেও সে মোটেই মুখচোরা নয়; বরং তার ঠিক উল্টো। কলেজে তার শ'য়ে শ'য়ে বন্ধু। কাজেই ট্রেন আসানসোল পৌঁছানোর মধ্যেই ওরা তাদের জীবনের অনেক কাহিনীই একে অপরকে বলে ফেলল।

মেয়েটি গুজরাতি। বয়স কুড়ি। দেশের এক নামকরা ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম। দিল্লিতেই বেড়ে ওঠা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি। আপাতত মিরান্ডা হলে ফাইনাল বছর। কলেজে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন।

পরের দিন একটু বেলায় ট্রেন যখন দিল্লিতে পৌঁছাল ততক্ষণে ওরা একে অপরের অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছে। মেয়েটি শেষমেশ বলেই ফেলল, 'এই নাও আমার ঠিকানা। একদিন ফোন করে চলে এসো। আমার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। বাবার অনেক রকম ব্যবসা আছে। লেখাপড়া শেষ করে অনায়াসে একটা ভাল চাকরি পেয়ে যেতে পারো।' মেয়েটির গলার স্বরে কী যেন এক অব্যক্ত ইঙ্গিত! নাকি ভবিষ্যতের হাতছানি!

ছেলেটি খুব খুশি। মেয়েটির ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা তো না চাইতেই পাওয়া গেছে। সেটাই তো আসল পাওয়া। আরো কত কথার মধ্যে দিয়ে যে বাদ বাকি যাত্রাপথটুকু কেটে গেল তা কেউই বুঝল না। হঠাৎ রেলগাড়ি নিউ দিল্লি পৌঁছে গেল।

দিল্লিতে পৌঁছে ট্রেনিংয়ের চাপ। অন্যান্য ট্রেনিদের সঙ্গে অফ টাইমে দিল্লি বেড়ানো, করিমের বিরিয়ানি, কনট প্লেস, কুতুব মিনার ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ক'টা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল বোঝাই গেল না। হলুদ শাড়ির কথা বেমালুম ভুলে গেল। পথিকে পথিকে দেখা, পথের আলাপন কতই তো হয়!

সেসব কথা আবার মনে পড়ল কলকাতা ফেরার মাসখানেক বাদে। পুরনো কাগজের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল সেই ছোট্ট চিরকুট। মেয়েলি হাতের লেখা। দিল্লির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পাড়ার ঠিকানা এবং মেয়েটির বাবার নাম দেখে তো ছেলের চোখ ছানাবড়া।

কিন্তু সে মেয়ে তার মনের মধ্যে যেন গেঁথে গেছে। শয়নে স্বপনে মনে পড়ে। শুনে বন্ধুরা ক্ষেপায়। কিন্তু তাতে কার কী আসে যায়?

ফোন করতে গেলে অনেক সাহস লাগে। যদি কথা না বলে? যদি তার বাবা ফোন তোলে? অনেক ভাবনাচিন্তা করে শেষমেশ একটা চিঠি লিখে ফেলল। ওই যেরকম হয় আর কি!

'সেদিন ট্রেনে আমরা খুব ভাল গল্প করেছিলাম। এখন খুব পড়ার চাপ। তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি।' ইত্যাদি...

চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে নিজেকে একটু হালকা লাগল। জবাব আসবে না সে তো জানাই আছে।

দিন দশেক বাদে একটা খাম এল। সেই চেনা হাতের লেখা - 'তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগল। কেন এলে না আমাদের বাড়ি? পড়ার খুব চাপ? তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি...' ইত্যাদি।

তারপর তিনদিন রাতে নিদ নাহি আঁখিপাতে। শেষে একটু সাহস সঞ্চয় করে একটা চিঠি লিখেই ফেলল – 'তোমার কথা রোজ মনে পড়ে।'

চার পাঁচ দিন পরেই জবাব মিলল। 'হ্যাঁ, আমিও তোমাকে মিস করছি।'

এর পর দুপক্ষেরই আর কোনো আড়ষ্টতা রইল না।

শুধু নিয়মিত চিঠি আর চিঠি | মনের যত কথা, হৃদয়ের যত কবিতা, সব উজাড় করে ঢেলে দেওয়া | কমপক্ষে এক'শ চিঠির আদান প্রদান হ'ল |

পরের বছর শীতকালে মেয়েটি জানাল বাড়ি থেকে পাত্র দেখা শুরু হয়েছে | ব্যবসায়ী পরিবারে মেয়েদের একটু তাড়াতাড়িই বিয়ে হয় |

ছেলেটি তখন সবে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে | কলকাতায় এক পুরনো পাড়ায় পুরনো বাড়িতে যৌথ পরিবারে ঘাড়ের ওপর ঘাড়ে থাকা | না আছে নিজের বাসস্থান, না আছে জমানো টাকা; তার ওপরে বিরাট বড়লোকের মেয়ে | কী জানি তারা ওকে কী চোখে দেখবে! সাতপাঁচ ভেবে একটু পিছিয়ে গেল সে | মুখ ফুটে ঠিক বিয়ের প্রস্তাবটা আর দিতে পারল না | যথাসময়ে একটি রঙচঙে দামী নিমন্ত্রণ কার্ড এল |

যাকে আমরা অধ্যায় বলি, সেটা মোটামুটি এখানেই শেষ হয়ে গেল |

তিন-চার বছর পরে ছেলেটিরও বিয়ে হ'ল | বাবা মা নিজেরা দেখেশুনেই পাত্রী জোগাড় করেছেন | সুন্দরী মেয়ে | বাংলা বলে, গান জানে, রন্ধন পটিয়সী এবং পাল্টি ঘর | আর কী চাই! সোনায় সোহাগা!

ধীরে ধীরে সবই হ'ল – চাকরিতে উন্নতি, নিজের ফ্ল্যাট, ফুটফুটে সন্তান | সপরিবারে সুখে শান্তিতে ও আনন্দে কেটে গেল অনেকগুলো বছর |

চাকরি সূত্রে অনেক জায়গা ঘুরে শেষে স্থিতি হ'ল নাগপুরে | তখন সে আর ছেলে নেই | একটা কম্পানির বেশ বড় গোছের কর্তা | সারাদিন মিটিং করেন আর সব কর্তাদের মতো |

একদিন কোন একটা জরুরি মিটিংয়ে গিয়ে এক উচ্চ প্রতিষ্ঠিত গুজরাতি ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয় | তাঁর পদবী শুনে হঠাৎই মনে পড়ে গেল সেই হলুদ শাড়িপরা মেয়েটিকে | একই পদবী | কী মনে করে মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করে বসলেন তাঁকে | বেরিয়ে পড়ল তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় | তাঁরই কাছে জানতে পারলেন যে সে মেয়েটি নাকি বিয়েথা করে বর, ছেলেপুলে নিয়ে এই শহরেই থাকে |

তার ঠিকানা ও ফোন নম্বরগুলো কয়েক দিনের মধ্যেই হাতে এসে গেল |

সাহস করে ফোন করতে আরো দিন পনেরো কেটে গেল | তারপর একদিন ফোন করলেন | কাজের লোক ফোন তুলল – 'ম্যাডাম বাড়ি নেই |'

বাব্বাঃ, বাঁচা গেল! কিন্তু মাথার পোকা তো ঘুরেই যাচ্ছে | কাজেই তিন দিন পরে আবার ফোন করলেন | এবার মেয়েটি নিজেই ফোন তুলল | গলার স্বর সেই একই রকম আছে | কি জানি কীরকম দেখতে হয়েছে |

নাম শুনে একবারেই চিনতে পারল মেয়েটি | পুরনো দিনের সেই উচ্ছ্বাস ফিরে এল গলায়, 'বলো কবে আসবে আমার বাড়ি? সবাই মিলে গল্প হবে | কত কথা জমে আছে |'

- 'শিগগিরিই আসব | ফোন করব তোমায় |'

ফোনটা নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ বেশ আনমনা হয়ে রইলেন বড়কর্তা | কত যুগ পরে আবার মনের মধ্যে ভিড় করে এল পুরনো সেই দিনগুলোর কথা | সেই শ'য়ে শ'য়ে চিঠি | সেই কথা আর কথা | সেই বুকের মধ্যে একটু কীরকম যেন লাগা |

বর্তমান জীবনের কথা ভাবলেন | বাড়ি, গাড়ি, সমৃদ্ধি, সুনাম, টাকা, পরিবারের উজাড় করা ভালবাসা | বড় আদরের স্ত্রী ও সন্তান |

জীবনের অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এসেছেন তিনি | অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এসেছে সেও | পুরনো দিনের স্মৃতি তার নিজের জায়গাতেই স্মৃতি হয়ে থাক | সেই ভাল |

আনমনে সেই নতুন ঠিকানা লেখা কাগজটা আবার পকেট থেকে বার করলেন | শেষবারের মতো পড়লেন | তারপর ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন | ব্রিফকেসটা বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি | বাড়ি যেতে হবে |

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

চিংড়ি

শঙ্কর তালুকদার

চিংড়ি একটি ছেলের নাম। তার আসল নাম এখন আর মনে পড়ে না। সত্যি কথা বলতে, তার আসল নাম কেউ কখনও মনে রাখার চেষ্টা করেছে বলেও বোধ হয় না।

রোগা ছিপছিপে ছেলেটি পড়াশোনায় ভাল ছিল না। সেটা বোধহয় সে পুষিয়ে নিত তার দুষ্টুমি ও দুরন্তপনায়। আমরা যতই সাহসিকতা বা দুরন্তপনা দেখাতাম না কেন, চিংড়ির তুলনায় তা সব সময় অতি নগণ্য বলেই মনে হতো। ফলে একদিকে যেমন সে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে বিরক্তিকর ছিল, অন্যদিকে বন্ধুদের কাছেও খুব একটা সমাদৃত ছিল না। সবার থেকেই তার বেশ খানিক দূরত্ব ছিল। একা একা সে কী ভাবত এবং কখন কী করে বসবে স্বয়ং ভগবানও বোধহয় তার দিক নির্ণয় করে উঠতে পারতেন না।

খুব সম্ভবতঃ, আমরা তখন সপ্তম শ্রেণীতে; আমি বাড়ি থেকে পড়াশোনা করলেও, চিংড়ি হস্টেলে থাকত। ফলে আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব খুব গভীর হবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু প্রায়শই তার নানান কীর্তির কথা কানে আসত। সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল এবার চিংড়িকে স্কুল থেকে তাড়ানো হবে।

আসলে চিংড়ির দুরন্তপনায় সবাই ব্যতিব্যস্ত ছিল। ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু করানো যেত না। কাজেই কোন উপায় না দেখে স্কুল ঠিক করল ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু কেন জানি না, যতবারই ঠিক হতো চিংড়িকে বাড়ি পাঠানো হবে, ততবারই কোন না কোনও কারণবশতঃ শেষ অবধি ওকে আর বাড়ি পাঠানো হতো না। সবকিছু আবার আগের মতোই চলতে থাকত।

একদিন সকালে স্কুলে এসে দেখি চারদিক থমথম করছে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। বাতাসও ভয় পেয়ে কোনও শব্দ না করে নিজের খেয়ালে বয়ে চলেছে।

কী ব্যাপার! অবশেষে জানা গেল চিংড়ি গাছ থেকে পড়ে হাত পা ভেঙ্গেছে এবং হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন।

সেদিন আর ভাল করে স্কুলের লেখাপড়া হ'ল না। জানা গেল সন্ধ্যেবেলা চিংড়ির উদ্দেশ্যে শোকসভা হবে। আমি অবাক মনে বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে লাগলাম চিংড়িকে নিয়েও শোকসভা করবে এই কর্তৃপক্ষ!

সন্ধ্যেবেলা যথারীতি আয়োজন পর্ব সারা হয়েছে। ছেলেদের হস্টেলের বারান্দায় সভা হবে। ধূপের গন্ধে ও ধোঁয়ায় বারান্দার আবহাওয়া ভারী হয়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে দুই একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে চিংড়ি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলল। আমি ভাবতে থাকলাম এই সভা আর কতক্ষণ চলবে! এবার বুঝি শেষ হয়ে এল। যখন উঠি-উঠি করছি, অবাক হয়ে দেখি এক এক করে বেশ কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা চিংড়ি সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

আশ্চর্য হওয়া তখনও বাকি ছিল বৈকি। চিংড়ি কত মহান ছেলে ছিল সে কথা বলতেই সকলে ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, বলতে গিয়ে চোখের জল ফেলে সে এক হুলুস্থূল অবস্থা! যে শিক্ষিকা তাকে তাড়াবার জন্য সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ নিতেন, তিনিই সবার থেকে বেশি কান্নাকাটি করলেন।

অল্প বয়সের বুদ্ধিতে বুঝতেই পারছিলাম না, সামনে যা দেখছি তা সত্যি, নাকি সবটাই আমার কল্পনা!...

সারপ্রাইজ

নন্দিতা ভট্টাচার্য

বাবা শখ করে নাম রেখেছেন নয়নের মণি, 'নয়না'| কলেজে যাতায়াতের পথে রাণার সাথে প্রেমে পড়ল | রাণার একটা জিনিস নয়নার খুব পছন্দের, রাণা খুব প্রটেক্টিভ | মেট্রোতে উঠলে যাতে কারো সাথে ছোঁয়া না লাগে, তাইজন্য রাণা আগলে রাখে নয়নাকে | রাণার এই আগলে রাখাটা নয়নার মন ভরিয়ে তুলল, ও বুঝল ঠিক মানুষটাকেই ভালবেসেছে সে | দুজনের সময় কীভাবে যে কেটে যেত দুজনেই টের পেত না; ফোনে রাত দুটো-আড়াইটা অবধি গল্প করত, কথা শেষই হতো না | এরপর নয়নার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করে | ভয়ে ভয়ে সে মাকে একদিন জানিয়ে দেয় রাণার কথা | আর বলে রাণা ছাড়া কারো সাথে যেন তার বিয়ে না দেওয়া হয় | ও যে রাণাকে ছাড়া বাঁচবে না! মা এক সময় বাবাকে জানায় রাণা ও নয়নার কথা | বাবা বলে, ঠিক আছে, ছেলেটাকে একদিন ডাকো, কথা বলি | নয়নাদের বাড়িতে রাণা আসে | মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা তাদের বিয়েতে রাজি হয়ে যায় | সেই রাতে নয়না আনন্দে ঘুমোতেই পারে না |

এরপর প্রায় প্রতিদিনই রাণা নয়নার বাড়িতে আসতে থাকে; নয়না আর তার বাবা মা'র সাথে আড্ডা-হাসি-মজাতে দিন কাটতে থাকে | প্রায় বছর দুই এইভাবে কেটে যায় | সামনেই নয়নার অনার্স ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা | আর ঠিক হয় পরীক্ষার পরে তাদের বিয়েটা হবে | বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায় | নয়নার স্বপ্ন সত্যি হতে মাত্র আর কয়েকটা হাতে গোনা দিন | সে তার মনের মানুষের সাথে জীবন কাটাবে – কত স্বপ্ন,কত আশা নয়নার মনে |

আজ কলেজে পরীক্ষা ক্যান্সেল হয়ে গেল | নয়না ভাবল হঠাৎ বাড়িতে গিয়ে মাকে সারপ্রাইজ দেবে | বিয়ের বেনারসীটাও আজকেই কিনতে যাবে ও | মা আর রাণাকে নিয়ে বেরিয়ে বাবাকে অফিস থেকে তুলে নেবে গাড়িতে | রাণাকে ফোন করে দিল যাতে ও নয়নার বাড়িতে চলে আসে | কিন্তু একী! ফোনটা তো সুইচড্ অফ্! রাণার এই এক বিচ্ছিরি সমস্যা! যখন তখন ফোনটা সুইচড্ অফ্ করে রেখে দেয়; খুব রাগ হয় নয়নার | ভাবল, আগে বাড়ি পৌঁছাই, তারপর আবার ফোন করে দেখব | আধঘন্টা পর বাড়ির কাছাকাছি এসে ফোন করল | নাহ্, আবার সুইচড্ অফ্! বাড়িতে কলিংবেলটা বাজাতে গিয়ে নয়না ভাবল মেন গেটের চাবি নিজেই খুলে ভেতরে গিয়ে সারপ্রাইজ দেবে মাকে | গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই অবাক, এখানে রাণার জুতো? আবার ফোন করে নয়না – হ্যাঁ, রিং হচ্ছে | ওই বেডরুমটা থেকে আসছে না রাণার ফোনের আওয়াজ! ঘরের দরজাটা আধখানা ভেজানো | দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, সেটা দেখার জন্য নয়না মোটেই প্রস্তুত ছিল না | রাণার সাথে ও কে? ঝাপসা হয়ে আসে নয়নার চোখ | আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিচ্ছে রাণা ওর মাকে | আর ওর মা? মা যে ছাড়তেই চাইছে না রাণাকে; ফোনও ধরতে দিচ্ছে না | মাথাটা বনবন করে ঘুরছে নয়নার | আবার ও ফোন করে রাণাকে | রাণা ফোন তুলে বলে, এখন বাইক চালাচ্ছি, পরে কথা বলব | নয়নার জীবনটা যেন এক মুহূর্তে থমকে গেল! এখন ওদের দুজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কী করে নয়না? দুজনেই যে নয়নার বড় আপন, বড় নিজের |

নয়না হঠাৎ ঘরে ঢুকে এল | ঘরে ঢুকতে দুজনেই অপ্রস্তুত | মা শাড়ি ঠিক করতে ব্যস্ত, আর রাণা...! নয়না শান্তস্বরে বলল, ভেবেছিলাম আজ তোমাদের সারপ্রাইজ দেব; কিন্তু আমি তো নিজেই সারপ্রাইজড্ হয়ে গেলাম গো! মা কিছু একটা বলতে চাইল – কিন্তু নয়না বলে উঠল, কোন মেয়ে যেন কখনও তোমার মতো মা না পায় |

নয়না ধীর পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল | অনেক পরে সন্ধ্যেবেলা পুলিশ এসে নয়নার ঝুলন্ত দেহটা নামিয়ে তার হাতেধরা একটা সুইসাইড নোট উদ্ধার করল | তাতে একটাই শব্দ লেখা "সারপ্রাইজ" | নয়না এখন নিছক একটা "বডি" | বাবা পাথর হয়ে বসে রইল | কেউ বুঝে উঠতে পারল না যে কে কাকে এই বিরাট সারপ্রাইজটা দিল? কেবল তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল একটা ভয়ংকর শব্দ "সারপ্রাইজ"!...

ত্রিবেণী

সফিক আহমেদ

১

অদ্ভুত ভাল লাগার শহর এই পিটসবার্গ | আমেরিকার পেনসেলভেনিয়া স্টেটের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই শহরে অ্যালেঘেনি, মননগাহেলা, আর ওহাইও, এই তিন নদীর সঙ্গমস্থল | এক সময় এই নগরী ছিল ইস্পাতের ব্যবসা কেন্দ্র | আজ সে গুগল, ফেসবুক, উবার, নোকিয়া, মাইক্রোসফ্টের মতো প্রযুক্তি সংস্থার পীঠস্থান | জগৎ বিখ্যাত কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ এবং আরো বহু কলেজ ইউনিভার্সিটি ছড়িয়ে আছে এই শহরে |

বসন্তের বিকেলে ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গের পাতাঝরা মহীরুহদের পাস কাটিয়ে হেঁটে যেতে যেতে উদাস চোখে সূর্যাস্তের শেষ আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল প্রফেসর অমিতাভ বোস | দেখতে দেখতে পঁচিশটা বসন্ত পেরিয়ে গেল এই শহরে | অলস পায়ে মাঠ পেরিয়ে এসে ক্যাথিড্র্যাল অফ লার্নিং-এর বিশাল দরজা ঠেলে ঢুকে বসল গিয়ে তার অতি পছন্দের কোণের ডেস্কে | চারিদিকে বই আর বই | এখানকার পরিবেশে মিশে আছে জ্ঞানের উপাসনা আর গির্জার পবিত্রতা | হাতের বইগুলোতে পেন্সিলের দাগ দিতে দিতে মনে মনে সে প্রস্তুতি নিচ্ছিল আগামীকাল ক্লাসে কীভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো দুরূহ বিষয়টা সহজবোধ্যভাবে পৌঁছে দেবে তার এক ঝাঁক বুদ্ধিদীপ্ত নতুন ছাত্রছাত্রীদের কাছে | গভীর মনোযোগসহ পড়তে পড়তে হঠাৎ বুকে একটা কম্পন অনুভব করল অমিতাভ | বুকপকেটে রাখা সেলফোনটা বার করে দেখল পর পর চার পাঁচটা মেসেজ এসে গেছে | নতুন রিসার্চ স্কলার এমিলি একের পর এক মেসেজ করেছে, 'আমি কি আসতে পারি তোমার কাছে? প্রথম তিনটে ক্লাসের পড়া বুঝতে একটু সাহায্য চাই | এই সেমিস্টারে যোগ দিতে আমার এক সপ্তাহ দেরি হয়েছিল ভিসা সংক্রান্ত সমস্যায় | তাই খুবই দুর্বোধ্য লাগছে তোমার ক্লাস ফলো করতে |'

এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে সেরকম পাঠ্যপুস্তকও নেই | সবসময় নতুন গবেষণা চলছে তাই অমিতাভ নিজেই তার নম্বর দিয়েছে সব স্টুডেন্টদের, যাতে নির্দ্বিধায় তারা তার সাহায্য চাইতে পারে |

- 'আসতে পারো, ক্যাথিড্র্যাল অফ লার্নিং-এর লাইব্রেরিতে | আমার ঘন্টাদেড়েক সময় আছে এখন |'

পোস্টগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের ক্যাম্পাসে হোস্টেল নেই, তাই স্টুডেন্টরা আশেপাশের কমিউনিটিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে | আধঘন্টা পর এমিলি যখন এল ডেস্কের সামনে, অমিতাভ তখন ডুবে আছে দুর্গম তত্ত্বের সমাধানে | হঠাৎ ক্যালভিন ক্লাইন পারফিউমের গন্ধে তার মনোসংযোগ ছিন্ন হয় | এই গন্ধটা তার খুব চেনা | চোখ তুলে দেখে মৃদু হাসি নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমিলি |

লাজুক হেসে এমিলি বলল, "আমি একটু আগেই এসেছি, আপনি যা মন দিয়ে পড়াশুনা করছেন, তাই ডিসটার্ব করতে সাহস পাচ্ছিলাম না |"

- "আরে না না, বসো এখানে | তুমি তো ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসে খুব মন দিয়ে ফলো করো আমার পড়ানো, তবে খুব একটা পার্টিসিপেট করতে দেখি না ক্লাসে |"

- "আসলে এই নতুন সাবজেক্টটা বুঝতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে, ক্লাসে প্রশ্ন করতে সাহস পাই না, কারণ সবাই আপনার কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে | আমি ডিসটার্ব করতে চাই না |"

- "আমি অ্যাডমিশন কমিটিতে ছিলাম | যতদূর মনে পড়ে তুমি কিংস কলেজ অফ লন্ডন থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছ, তোমার অসুবিধা হবে না ক্লাস ফলো করতে | আমি ফার্স্ট তিনটে ক্লাসের লেকচার নোটস তোমাকে ইমেল করে পাঠাচ্ছি, সঙ্গে কিছু রেফারেন্স লিস্টও পাঠাব | এগুলো পড়ার পর তুমি আমার কাছে এলে তোমাকে সাহায্য করা সহজ হবে |"

বুকপকেটে রাখা ফোনটা আবার কেঁপে উঠল, ছোট্ট একটা মেসেজ, 'হানি ইউ আর লেট এগেন |'

মনে পড়ে গেল, আজ আভাকে নিয়ে ডিনারে যাওয়ার প্ল্যান, যেটা সে বেমালুম ভুলে গেছে |

- "সরি এমিলি, আজ আমাকে উঠতে হবে, তোমার ইমেল আইডিটা দাও, আজ রাত্রেই তোমাকে আমি স্টাডি মেটেরিয়াল পাঠিয়ে দেব |"

লাইব্রেরির দরজা পেরিয়ে দুজনে বাইরে এসে দেখে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে | কিছুটা পথ একসাথে চলে তারপর অমিতাভ এগিয়ে যায় পার্কিংলটের দিকে, আর এমিলি বাস

স্ট্যান্ডের দিকে। গাড়ি স্টার্ট করেও মনে হ'ল যেন পারফিউমের রেশটা রয়ে গেছে।

২

মননগাহেলা নদীর উপর দিয়ে বার্মিংহাম ব্রিজ পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছাতে প্রায় রাত আটটা হয়ে গেল। আভা একটা ফর্মাল ওয়েস্টার্ন গাউন আর সাদা কালো গয়নায় সেজে থমথমে মুখে বসে আছে। আজ ডিনারের জন্য পিটসবার্গের সবথেকে অভিজাত রেস্টুরেন্টে বুকিং করেছে আভা। অমিতাভ কাঁচুমাচু মুখে ব্রিজে ট্রাফিক জ্যামের মিথ্যে অজুহাত দিয়ে তাড়াহুড়ো করে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল। রেস্টুরেন্টে পৌঁছে ফয়ারে গ্রান্ড-পিয়ানোর টুংটাং শব্দ আর জাঁকজমক দেখে খুশি হয়ে উঠল আভা।

রাগ অভিমান ভুলে ক্যাবারনে ওয়াইনে চুমুক দিয়ে আবদার করল, "উড ইউ মাইন্ড ফর এ ডান্স অমিতাভ?"

এডেলের 'মেক ইউ ফীল মাই লাভ' গানটা যেন রোম্যান্টিক মুড বুঝেই বাজানো হ'ল।

'When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love
When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love
I could make you happy,
make your dreams come true
Nothing that I wouldn't do
Go to the ends of the Earth for you
To make you feel my love
To make you feel my love.'

এই গানের সুললিত ছন্দ আর কথায় আভা হারিয়ে গেল অন্য এক জগতে। এর পর ফাইভ কোর্স ডিনার শেষে বাড়ি না গিয়ে স্লো ড্রাইভ করে অ্যালেঘেনি ল্যান্ডিং পার্কে গাড়ি দাঁড় করাল অমিতাভ। সামনে তখন আলোকোজ্জ্বল পিটসবার্গ শহরের প্রতিচ্ছবি ভাসছে অ্যালেঘেনি নদীর বুকে। এই রোম্যান্টিক পরিবেশে একটা দীর্ঘ চুম্বনের পর গাঢ় গলায় আভা বলল, "আমি এই দিনটা জীবনেও ভুলব না অমিতাভ। এই দিনটা আমাদের কারো জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী নয়। এই সেই দিন যেদিন আমরা সামাজিক অনুমোদনের আগেই প্রথম মিলিত হয়েছিলাম।"

এর পর ওয়াইন আর রোম্যান্টিক পরিবেশের রেশ নিয়ে যখন তারা বাড়ি পৌঁছাল, রাত তখন প্রায় এগারোটা।

কোনোরকমে জামাকাপড় বদলে আভা ঝাঁপিয়ে পড়ল অমিতাভর বুকে। আবেগঘন মুহূর্তে মনে হ'ল কুড়ি বছর আগের আভা তার উদ্দাম উচ্ছল দ্যুতি ছড়াচ্ছে। বিছানায় ঢুকে সেলফোনটা সাইলেন্ট করার আগে চোখে পড়ল এমিলির টেক্সট মেসেজ – ইমেল আইডি পাঠিয়েছে আর সঙ্গে লেখা, 'অপেক্ষায় আছি।'

কথা দিয়েছিল, তাই মেলে লেকচার নোটস আর রেফারেন্স পাঠিয়ে ডুব দিল নরম বিছানায়। আভার কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অমিতাভ।

৩

পঁচিশ বছর আগে পড়াশুনা করতে আমেরিকায় এসেছিল অমিতাভ। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, ফুল স্কলারশিপ নিয়ে এসেছিল; তবে প্লেনভাড়া জোগাড় করার সামর্থ ছিল না। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্রীতমার বাবা।

শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেল থেকে প্রত্যেক শুক্রবার রাতে অমিতাভ চলে যেত ত্রিবেণীতে। পাড়ার ডাকসাইটে সুন্দরী শ্রীতমার সঙ্গে তখন চুটিয়ে প্রেম চলছিল। শ্রীতমার বাড়ির লোকজনও প্রশ্রয় দিয়েছিল। ব্রিলিয়ান্ট এঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট গরিব হলেও ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। শ্রীতমার বাবা ত্রিবেণী টিস্যু কম্পানির ম্যানেজার। কম্পানির বিশাল কোয়ার্টারে আভিজাত্য আর প্রাচুর্যের ছাপ। শ্রীতমা তখন হুগলী মহসিন কলেজের সায়েন্সের ছাত্রী। প্রত্যেক সপ্তাহান্তে শ্রীতমাকে পড়াতে গিয়ে মাসিমার হাতে সযত্নে তৈরী কিছু না কিছু জলখাবার আর চায়ের পর প্রায়ই তিনি বলতেন, "আজকে রাতের খাবারটা খেয়ে যাও।"

লোভনীয় খাবার আর শ্রীতমার উদ্ভিন্ন যৌবনের আকর্ষণ ফেলে অনেকদিনই তার বাড়ি ফেরা হতো না। শ্রীতমার লাগাম ছাড়া ঘনিষ্ঠতায় আবিষ্ট হয়ে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যেত।

অমিতাভর মাও যেন সব বুঝে, ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কিছু

মনে করতেন না। কর্মহীন বাবারও সংসারের ব্যাপারে কোনো মতামত দেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছাও ছিল না।

দেখতে দেখতে ফাইনাল ইয়ার এসে গেল। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে GRE পরীক্ষায়ও বসল অমিতাভ। যদিও ক্লাসে খুব ভাল রেজাল্ট হয়নি, কিন্তু GRE-তে অভাবনীয় ভাল স্কোর আর শিক্ষকদের উৎসাহে বেশ কিছু মার্কিন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করল সে। যেদিন ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গের হলুদ খামে ফুল স্কলারশিপসহ মাস্টারস ডিগ্রীতে ভর্তি হওয়ার অফার লেটার এল, সেদিন বিশ্বাসই হচ্ছিল না এটা স্বপ্ন না সত্যি।

এক শীতের সন্ধ্যায় শ্রীতমার সঙ্গে বহু সূর্যাস্ত দেখা ত্রিবেণীর ঘাটে যখন অমিতাভ তার হাত ধরে জানাল আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন আর স্কলারশিপের খবর, শ্রীতমার আরক্ত মুখে তখন একটাই প্রশ্ন যেন থমকে দাঁড়াল, "আমার কী হবে অমিতাভ? আমি যে তোমাকে আমার সবটুকু দিয়ে দিয়েছি।" তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শ্রীতমা।

- "আমি ফিরে আসব শ্রীতমা। অপেক্ষা কোরো আমার জন্য। নিয়ে যাব তোমায় আমেরিকাতে, ঘর বাঁধব আমরা। একটু সময় দাও।"

৪

আজ একটু দেরিতে ক্লাস, তাই আয়েশ করে বেকড টমেটো, টোস্ট আর একগ্লাস অরেঞ্জ জুস নিয়ে বারান্দার ছোট্ট টেবিলে বসে রোদে পিঠ দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছিল অমিতাভ। সামনের হথর্নস গাছের আলোছায়ায় লেজ উঁচিয়ে কয়েকটা লোমশ কাঠবিড়ালী দৌড়োদৌড়ি করছে। আভা সকালেই বেরিয়ে গেছে তার কাইরোপ্র্যাক্টর ক্লিনিকে। সে পিটসবার্গে এক নামজাদা কাইরোপ্র্যাক্টিক ডাক্তার।

অলসভাবে আইফোনের স্ক্রিনে চোখ বোলাতে বোলাতে ভেসে উঠল এমিলির মেসেজ – 'আজ বিকেলে ক্লাসের পর কি একটু সময় দেওয়া যাবে?'

এমিলি রায়না আজকাল ক্লাসে সামনের ডেস্কে বসে, আর বেশ ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্নও করে। ক্লাস অ্যাসাইনমেন্টও খুব ভাল করছে। ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আর ব্রিটিশ চেহারায় ভারতীয় নমনীয়তা ও কোমলতা একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরী করে। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে প্রায়ই চোখ চলে যায় এমিলির দিকে। অমিতাভ টেক্সটের উত্তরে জানাল, 'আজ পাঁচটার পর কোনো ক্লাস নেই। আসতে পারো লাইব্রেরিতে।'

মেসেজ এল, 'লাইব্রেরিতে নয়, আমি হেইঞ্জ মেমোরিয়াল চ্যাপেলে যাব সাড়ে পাঁচটায়, প্লিজ ওখানেই এসো।'

এমিলি রায়না নামটা কিছুদিন অবচেতন মনে ফিরে ফিরে আসছিল। আজ ক্লাসের পরিধির বাইরে তাকে জানার আগ্রহে এই ডাক অগ্রাহ্য করতে পারল না অমিতাভ।

হেইঞ্জ মেমোরিয়াল চ্যাপেল ক্যাম্পাসের মধ্যেই। এর অসাধারণ আর্কিটেকচার আর বিশাল লাল দরজাতে চোখ আটকে যায় সকলের। বিকেলের আলোতে চ্যাপেলের লাল দরজার সামনে উজ্জ্বল হলুদ রঙের টপ আর জিন্সে অসাধারণ লাগছিল এমিলিকে। চ্যাপেল ল্যান্ডিংয়ের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে অমিতাভ এমিলির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ চার্চে কেন?"

- "প্রশ্নের উত্তর পরে দেব, আগে এসো আমার সঙ্গে।"

চ্যাপেলের মধ্যে স্টেইনেড গ্লাসের জানলার থেকে আসা আলো আর ভাবগম্ভীর পরিবেশে এমিলি এগিয়ে গেল বেদির কাছে। আটাশটা মোমবাতি জ্বালাল, তারপর ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল দশটা মোমবাতি। নতজানু হয়ে প্রার্থনার পর যখন ঘুরে দাঁড়াল, তার দুচোখে তখন জলের ধারা। ইতস্তত দ্বিধা কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল অমিতাভ। ধীরপায়ে চ্যাপেলের বাইরে বেরিয়ে অমিতাভর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে এমিলি বলল, "আজ আমার আটাশতম জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে আমাকে সঙ্গ দেওয়ার কেউ নেই, তাই তোমার থেকে একটু সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য। নিশ্চয়ই ভাবছ দশটা মোমবাতি কেন নিভিয়ে দিলাম? এই দশটা বছরে আমার জীবন থেকে সব আনন্দ হারিয়ে গেছে, তাই এই দশটা মোমবাতির আলো আমি জ্বালিয়ে রাখতে চাই না।"

- "এমিলি, আজ আমি জানতে চাইব না তোমার জীবনের অন্ধকারময় অধ্যায়। সে না হয় আরেকদিন শুনব। সেভাবে তোমাকে জানারও তো সুযোগ হয়নি। তোমার ভারতীয় পদবি সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল আছে। আজ তোমার জন্মদিন, আমাকে সুযোগ দাও তোমার মন ভাল করার। চলো, বাকি বিকেলটা পয়েন্ট স্টেট পার্কে কাটাই।"

পয়েন্ট স্টেট পার্কে হাসিঠাট্টা, ভেন্ডিং স্টল থেকে আইসক্রিম খাওয়া, কুয়াশার মতো ফোয়ারার জলের কণায় ভেজা আর

দিনের শেষ রোদ্দুর গায়ে মেখে তিন নদীর সঙ্গমে বসে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে অমিতাভ ফিরে যাচ্ছিল ত্রিবেণীর ঘাটে। শেষ বিকেলের রোদে এমিলির মমতাময় মুখে যেন শ্রীতমার ছায়া দেখতে পাচ্ছিল সে। মুহূর্তের অসাবধানতায় ভুলে গিয়েছিল ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্ক। নিজের অজান্তেই এমিলির কাঁধে হাত রেখে কাছে টেনে নিয়েছিল। এমিলিও নির্দ্বিধায় সমর্পণ করেছিল নিজেকে। দীর্ঘ চুম্বনের পর হঠাৎ সম্বিৎ ফিরতে রীতিমতো লজ্জিতভাবে অমিতাভ বলল, "আই অ্যাম রিয়েলি সরি, এমিলি।" উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়ে এমিলি বলে, "সরি কেন? ইউ মেড মাই ডে অমিতাভ। আমি ভীষণ একা, থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।"

সবুজ মাঠ পেরিয়ে হেঁটে ফেরার সময় দুজনের আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছিল। গাড়িতে ফেরার পথে কারোর মুখে কোনো কথা নেই, যেন নিস্তব্ধতাতেই এই সুন্দর বিকেলের উপহারটা হৃদয়ঙ্গম করছিল দুজনে। এমিলিকে ওর বাড়ির কাছে নামিয়ে দেওয়ার সময় গালে হালকা একটা চুমু খেয়ে "উইশ ইউ এ ভেরি ভেরি হ্যাপি বার্থডে, অ্যান্ড হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ড্রিম," বলে বাড়ির পথে যেতে যেতে বড্ড আনমনা হয়ে পড়ছিল অমিতাভ।

বাড়ি এসে দেখে আভা অপেক্ষা করছে সাপারের জন্য। কাপড় বদলে স্যুপ আর স্যান্ডউইচ দিয়ে সেরে নিল রাতের খাওয়া। ঘন্টাখানেক CNN, FOX চ্যানেল দেখতে দেখতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বন্ধ করে দিল টিভি। ফোনের টুং টাং শব্দ আর নীল আলোতে চোখ পড়তে দেখে, এমিলির মেসেজ, 'আজকে একটা বিশেষ জন্মদিন উপহার দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অমিতাভ।'

উত্তরে একটা লাভ ইমোজি আর আটাশটা গোলাপফুল ইমোজি পাঠিয়ে ফোনটা সাইলেন্ট করে দিল অমিতাভ।

৫

অপেক্ষা তো করেছিল শ্রীতমা। দেখতে দেখতে তিনটে বসন্ত পেরিয়ে গেল। প্রথম প্রথম ঘন ঘন ফোন, ইমেলে আমেরিকার চাকচিক্যময় ছবি আর প্রেমালাপের বন্যা বইত। আস্তে আস্তে এই distant relation-এ ভাঁটা পড়তে লাগল। অমিতাভর পড়াশুনার চাপে যোগাযোগ কমে আসছিল। শ্রীতমার বাবারও রিটায়ারমেন্টের আগে তাঁর একমাত্র মেয়েকে পাত্রস্থ করার চাপ বাড়ছিল। অমিতাভ জানাল মাস্টার্স শেষ হলেও, পিএইচডি প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চায় না; তাই এখনই দেশে ফিরতে পারবে না।

- "আরেকটু অপেক্ষা করো শ্রীতমা। পিএইচডি হলে তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে আসার ভিসা পেতে অসুবিধা হবে না।"

এরপর অভিমানে অমিতাভর সাথে যোগাযোগ প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিল শ্রীতমা।

মাস্টার্স শেষ করে পিএইচডি প্রোগ্রামে ঢুকে দেশে ফিরতে ফিরতে কেটে গিয়েছিল প্রায় পাঁচ বছর। গিয়েছিল অমিতাভ ওই বাড়িতে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শ্রীতমার মা দরজা খুলে দিলে সেই উষ্ণ অভ্যর্থনা আর খুঁজে পেল না সে। শ্রীতমার মা বাবার সাথে দেখা করেই সে ছুটেছিল শ্রীতমার খোঁজে।

মা বাধা দিয়ে কিছু বলতে গেলে চুপ করিয়ে দিয়েছিল; বলেছিল, "আমি শ্রীতমাকে সারপ্রাইজ দিতে চাই।"

শ্রীতমার বাড়িতে ছিল তার অবাধ গতি, তাই দ্রুতপদে উঠে এল উপরে শ্রীতমার ঘরে। গিয়ে দেখে আধো অন্ধকারে পিছন ফিরে বসে আছে শ্রীতমা। পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে তার চোখ ঢেকে ক্যালভিন ক্লাইন পারফিউমটা হাতে দিয়ে বলেছিল, "দেখো শ্রীতমা, কী এনেছি তোমার জন্য।"

এক মুহূর্ত সময় লেগেছিল আকস্মিকতা কাটাতে। অমিতাভর হাত সরিয়ে দিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেই পারফিউম। ছড়িয়ে পড়েছিল কাঁচের টুকরো সারা মেঝেতে; ফ্রেঞ্চ পারফিউমের গন্ধে ভরে উঠেছিল সারা ঘর। ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শাখা-সিঁদুর-পরা শ্রীতমা। শ্রীতমার আরক্ত চোখের চাউনিতে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল অমিতাভ।

- "বড় দেরি করে ফেলেছ অমিতাভ। এতগুলো নিষ্ফলা বসন্তের একাকীত্ব, বাবা-মা'র চাপ আর সহ্য করতে পারিনি। সানাইয়ের সুরে তোমার বিরহের সুর একাকার হয়ে গিয়েছিল আমার জীবনে। মেনে নিতে হয়েছিল ঘরের দরজায় আসা সম্বন্ধ। অনির্বাণ আমেরিকার নাগরিক, সফল ব্যবসায়ী, ধনকুবের। জাঁকজমকের বিয়ে, ফুলশয্যা, হানিমুন সব হয়েছে প্রথামতো। দু'সপ্তাহ পর অনির্বাণ ফিরে গেছে আমেরিকায়। ভিসা অ্যাপলাই করে নিয়ে যাবে আমাকে, আবার অপেক্ষা শুরু আমার জীবনে। আমেরিকার আবাসন দপ্তরের নিয়ম কানুনের কড়াকড়িতে ভিসা পেতে দেরি হচ্ছে বলে প্রায় এক বছর কেটে গেছে; অপেক্ষাই আমার জীবনের নিয়তি।"

এতগুলো কথা বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল শ্রীতমা | আশাহত, বাকরুদ্ধ অমিতাভ দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে পারল না শ্রীতমাকে আগের মতো বুকে জড়িয়ে শান্ত করতে | পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল দরজার দিকে – বেরিয়ে গেল শ্রীতমার ঘর, শ্রীতমার বাড়ি, শ্রীতমার জীবন থেকে | শুধু রয়ে গেল ক্যালভিন ক্লাইনের সেই গন্ধ, যা আজও লেগে আছে অমিতাভর মনে আর ঘ্রাণে |

৬

এক মাস পর যখন কলকাতা থেকে দিল্লির ফ্লাইটে উঠেছিল অমিতাভ, তখনও শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল, ত্রিবেণীর ছোটবেলা, বাবা-মা, শ্রীতমা আর ত্রিবেণী-ঘাটের স্মৃতি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে | শ্রীতমার ঘরের ভাঙা পারফিউমের বোতলের গন্ধ ফিরে ফিরে আসছিল তার নাকে | দিল্লি থেকে নিউ ইয়র্ক ফ্লাইটে উঠে প্রায় জোর করেই স্মৃতিমেদুরতা ঝেড়ে ফেলবার জন্য বেশ কয়েকটা স্কচ চেয়ে নিল এয়ার হোস্টেসের কাছে | বেশিরভাগ স্টুডেন্টদের আর্থিক অনটনের সঙ্গে যুঝতে হয় আমেরিকাতে | তাই ফ্লাইটে দেওয়া ফ্রি ড্রিঙ্কস খুব উপভোগ করছিল | ডিনার শেষ করে, একটা পোর্ট ওয়াইন নিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল ঘাড়ের বালিশে মাথা রেখে | পনেরো ঘন্টার লম্বা ফ্লাইটে নিউ ইয়র্ক, তারপর আরো এক ঘন্টার ফ্লাইট নিয়ে যখন পিটসবার্গে পৌঁছাল, তখন যদিও দিনেরবেলা, তবু টাইম ডিফারেন্স আর চূড়ান্ত ক্লান্তিতে অ্যাপার্টমেন্টের বিছানায় গা এলিয়ে দিল অমিতাভ |

পরদিন থেকে আবার পিএইচডি প্রোগ্রামের প্রচুর চাপ শুরু | পড়াশুনার চাপের সঙ্গে ছিল আর্থিক অনটন | রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের টাকায় কোনরকমে চলত তিনজনে শেয়ার করা একটা অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া আর খাওয়া খরচ | অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর মালকিন Reba Adair খুবই সহৃদয় মহিলা, উপরতলাতে থাকতেন একাই | সময় পেলেই গল্প করতেন অমিতাভদের সঙ্গে | তাঁর এক মেয়ে থাকে পাশের শহরে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে | কখনো কখনো দরজার সামনে কেক, স্যান্ডউইচ বা শুকনো খাবার রেখে যেতেন রেবা; অসময়ে আসা ছাত্রদের যাতে একটু সুবিধে হয় | অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া দিতে দুএক সপ্তাহ দেরি হলেও কিছু বলতেন না |

পরের বছর যখন পিএইচডি শেষের পথে, তখন আমেরিকাতে হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে অমিতাভ | আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় | ঠিক তখনই দুজন রুমমেট অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায় | একা পুরো ভাড়া দেওয়া অসম্ভব, তাই কোথায় যাবে এই চিন্তায় পিএইচডি থিসিসে মন দিয়ে কাজ শেষ করতে পারছিল না | রেবা তার দুরবস্থা দেখে বললেন, "তুমি আমার ছেলের মতো; আমার তিনতলার একটা ঘরে তুমি কম ভাড়ায় থাকতে পারো | আমি তো একাই থাকি |"

এ যেন হাতে চাঁদ পাওয়া! এই অজানা, অচেনা দেশে রেবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা সত্যিই অভাবনীয় |

রেবার অ্যাপার্টমেন্টের একপ্রান্তে একটা ছোট ঘরে থেকে বেশ ভালই চলছিল অমিতাভর | কোনো কোনো উইকেন্ডে রেবার মেয়ে, আভা এলে একটু অস্বস্তি হতো | প্রাইভেসির অভাব বোধ করত আভা | কখনো বিরক্ত হয়ে মাকে বলতে শুনেছি, "তোমার উচিত হয়নি বাইরের লোককে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসা |" তবে ভাল মুডে থাকলে হেসে কথাও বলত সে | ওর স্বল্পবসনা যৌবন মাঝে মাঝে অমিতাভকেও অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলত | অমিতাভর মনে হতো আভা তার অস্বস্তিটা আড়চোখে দেখে, আর বেশ উপভোগ করে | উইকেন্ড কাটিয়ে সোমবার সকালে ফিরে যেত সে কলম্বাস, ওহাইওতে | প্রথম দিকে অমিতাভর উপস্থিতি অপছন্দ করলেও আস্তে আস্তে আভা বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছিল অমিতাভর সঙ্গে | কখনো কখনো সে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতে ভালবাসত ওর বয়ফ্রেন্ড Zachকে নিয়ে | Zach ওহাইওতে জেনারেল কন্ট্রাক্টরের ব্যবসা করে | ওরা স্কুলের বন্ধু | একসাথে থাকে শহরতলিতে | তবে মাঝে মাঝে খুব চিন্তিতও লাগে আভাকে | জিজ্ঞাসা করলে সহজে কিছু বলতে চায় না |

এক শনিবার সন্ধ্যায় রেবা বেরিয়েছিলেন কোনো প্রতিবেশীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে | আভা একা বসে ড্রিংক করছিল | মুখোমুখি হতে আভা বলে ওঠে, "আমি খুব বিপদে পড়েছি অমিতাভ, তোমার সাহায্য চাই | আমার ব্রেক-আপ হয়ে গেছে Zach-এর সাথে | বাস্টার্ড Zach, আমার অজান্তে কম্পানির পার্টনারের সাথে প্রেম করছিল দিনের পর দিন |" এই বলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে; অমিতাভ ধরে ফেলতে আভা তার শরীরের ভার ছেড়ে দিল অমিতাভর উপর | আভার স্বল্প-বসন উদ্ধত যৌবনের স্পর্শ অমিতাভকেও উত্তেজনায় মদির করে তুলেছিল | তবে অসহায়তার সুযোগ না

নিয়ে সে আভাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় পৌঁছে দিল। নিজের ঘরে ফিরে এসে পড়াশোনায় আর মন বসাতে পারল না অমিতাভ। পরের সপ্তাহে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আভা ফিরে এল মায়ের কাছে।

৭

এমিলির সম্বন্ধে কৌতূহলটা বেড়েই চলেছে সেদিন ওর জন্মদিনের বিকেলটা একসাথে কাটানোর পর থেকে। এমিলির একাকীত্ব, অসহায়তা আর তার কোমল মুখে শেষ বিকেলের আলোর ছটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিল না সে। সেদিন ইউনিভার্সিটিতে যাবার পর বোর্ড অফ ট্রাস্টির চ্যান্সেলরের মৃত্যুর খবর আসায় হঠাৎ ছুটি ঘোষণা করা হ'ল। নিজের ঘরে অলসভাবে চেয়ারে বসে অমিতাভর হাত চলে গেল ফোনের স্ক্রিনে। এমিলির পাঠানো মেসেজগুলো স্ক্রল করতে করতে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিল আনমনে।

- 'কী করছ, এমিলি?'

বেশ কিছুক্ষণ কোনো উত্তর না আসায় একটা অস্থিরতা অনুভব করছিল, আর নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছিল তার মনের এই বিচিত্র অবগতিতে। সাইলেন্ট করে রাখা ফোন vibrate করে আলো জ্বলে উঠতেই দেখল এমিলির মেসেজ, 'সো সরি, ফোনে চার্জ ছিল না। ক্লাস ছুটি হতেই বাড়ি চলে এসেছি, getting bored.'

- 'আমারও বিশেষ কাজ নেই, চাইলে আমার সাথে লাঞ্চে জয়েন করতে পারো।'

- 'নিশ্চয়ই, খুব ভাল হবে। আমাকে আধঘন্টা সময় দাও, তৈরী হয়ে নিচ্ছি।'

সাড়ে এগারোটা নাগাদ এমিলির বাড়ির মোড় থেকে এমিলিকে তুলে নিল গাড়িতে।

- "চলো, আজ আমার প্রিয় জায়গা লেকভিউ গল্ফ রিসোর্টের লেকভিউ লবিতে আউটডোর লাঞ্চ করব। ইউ উইল রিয়েলি লাইক ইট।"

দেড়ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে মরগ্যান টাউন গল্ফ রিসোর্টে পৌঁছাতে প্রায় বেলা একটা বেজে গেল। শীতের হালকা রোদে পিঠ দিয়ে, লেকের ধারে মখমলের মতো সবুজ গালিচার গল্ফ কোর্সের দিকে তাকিয়ে বেকড স্যামন, প্রণ ককটেল সহযোগে জিন অ্যান্ড টনিকে চুমুক দিতে দিতে গল্পে মশগুল হয়ে গেল অমিতাভ আর এমিলি। একের পর এক জিনের হালকা আমেজে আস্তে আস্তে এমিলির সবরকম মানসিক সতর্কতার আবরণ একে একে খসে পড়তে লাগল। আবেগপ্রবণ হয়ে বলতে থাকল তার জীবন-কাহিনী –

"আমার মা চেরিল বেকার থাকত লন্ডন ইস্ট এন্ডে, দরিদ্র পাড়াতে। পারিবারিক বেকারিতে কাজ করে দিন কাটত। এই অঞ্চলে ব্রিটিশ আইল থেকে আসা বহু ইমিগ্র্যান্টদের বসবাস। জন্মের পর প্রথম দশ বছর কে আমার বাবা সেই উত্তর মা দিতে পারেনি। প্রশ্ন করলে বলত, 'আমি তোর বাবা, আর আমিই তোর মা।' সুন্দরী মায়ের কাছে অনেক লোকের আনাগোনা ছিল। কিন্তু কারো সাথেই ঘর বাঁধেনি মা। এক এক সন্ধ্যায় গান চালিয়ে, ড্রিংক করে বেহুঁশ হয়ে থাকত। ভয়ে ভয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে আসা লোকজনদের দেখতে পেতাম – হাসিঠাট্টা, ড্রিঙ্কস, গানবাজনা বাড়তে বাড়তে একসময় অশ্লীলভাবে মাকে ব্যবহার করত তারা। ভয়ে চোখ বন্ধ করে নিতাম। সকালে উঠে আবার বেকারির কাজে লেগে যেত মা। আমার পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সামনেই একজন আমার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। মা নেশাতুর অবস্থায় থাকলেও ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য; হুইস্কির বোতল দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা মানুষটাকে ঠেলে দরজার বাইরে রাস্তায় ফেলে দেয়। আমাকে জড়িয়ে সারাটা রাত দরজা বন্ধ করে জেগে বসে থাকে মা। পরদিন সকালে পুলিশ এসে মাকে ধরে নিয়ে যায় আর মা'র তিন বছর জেল হয়। বেকারির পিছনদিকে একটা ছোট ঘরে আমার দিদিমা আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল তিন বছর। খাওয়া দাওয়া পৌঁছে দিত ঘরে, আর বই নিয়ে এসে আমাকে পড়াত দিদিমা। স্কুলেরও মুখ দেখিনি। সেলফ ডিফেন্সের জন্য ভায়োলেন্ট ক্রাইম করতে হয়েছে এটা মেনে নেওয়াতে কোর্ট অর্ডারে মা মুক্তি পেয়ে ফিরে আসে।"

এতটা বলে এমিলি চোখের জল আর ধরে রাখতে পারল না। অমিতাভ তার একটা হাত ধরে পিঠে হাত রেখে বলল, "আজ থাক এমিলি, অন্যদিন নাহয় শুনব বাকি কথা।"

এমিলি উঠে গেল ওয়াশরুমের দিকে, অমিতাভর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

এমিলি চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে এসে বসল চেয়ারে। মুডটা বদলানোর জন্য অমিতাভ সার্ভারকে ডেকে একটা লাভা কেক

আর ভ্যানিলা আইসক্রিমের অর্ডার দিল | অনেকটা সামলে উঠেছে এমিলি|

- "সরি এমিলি, তোমার এই ডিস্টার্বড চাইল্ডহুড মেমারি শেয়ার করতে অযথা দুঃখ পেলে|"

- "না অমিতাভ, আমি নিজেই এই দুঃখ সবসময় নিজের মধ্যে জাগিয়ে রাখি | নিজেকে অনুপ্রাণিত করি আমার নিজেরই সীমা অতিক্রম করতে | সবসময় নিজের মধ্যেই গুমরে মরি, আজ তোমাকে বলে আমার মনের বোঝা অনেকটা হালকা হ'ল|"

মেল্টেড লাভা কেক আর ঠান্ডা আইসক্রিম মুখে তুলে আবার বলতে শুরু করল এমিলি, "মা ফিরে আসার পর বেকারি ছেড়ে আমরা চলে যাই ব্রিকলেনে, একটা কম ভাড়ার বাড়িতে| একটা কর্নার স্টোরে মা চাকরি শুরু করে, আর আমাকেও একটা কমিউনিটি স্কুলে ভর্তি করে দেয়| এই অঞ্চলে অনেক দেশের গরিব ইমিগ্র্যান্টরা থাকত, বিশেষত বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান থেকে আসা রিফিউজিরা | কর্নার স্টোরে প্রায়ই আসত সুদর্শন, নম্র, এক ভারতীয় ভদ্রলোক | মায়ের সাথে সৌজন্য বিনিময়, ছোটখাটো কথাবার্তায় বেশ ভাব জমে যায়| আদিত্য রায়না, ইন্ডিয়ার কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দা ছিল | বিভিন্ন কম্যুনাল ডিস্টারবেন্স থেকে বেরিয়ে এসে, রেফিউজি স্টেটাসে আশ্রয় নেয় ব্রিটেনে| আমার ন'বছর বয়সের জন্মদিনে মা আদিত্যকে নিয়ে আসে বাড়িতে | আলাপ করিয়ে দেয় বন্ধু হিসাবে; তবে আমার শৈশবের চোখেও ধরা পড়েছিল যে আদিত্য মায়ের বন্ধুর থেকেও বেশি কাছের কেউ | আমার এতদিনের দেখা মায়ের সঙ্গীদের থেকে এক্কেবারে আলাদা | আমার সাথেও খুব ভাব হয়ে গেল আদিত্যর | রবিবার দোকান বন্ধ থাকলে আমরা প্রায়ই একসাথে পিকনিক করতে যেতাম | মা তার বেকিং-এর দক্ষতা ভোলেনি তখনও | বাড়ির বানানো কেক, আর আদিত্যর আনা ড্রাই ফ্রুটস নিয়ে আমরা চলে যেতাম টেমস নদীর ধারে| পরের বছর আমার বোহেমিয়ান মা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আদিত্যকে তোর বাবা হিসাবে মেনে নিতে পারবি|' আমার দুচোখ জলে ভরে এসেছিল, ধরা গলায় মাকে বলেছিলাম, 'বাবা কাকে বলে তাই তো জানি না মা, তবে আদিত্যকে বাবা বলে ভাবতে ভাল লাগবে|'

মা আমাকে অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে চুপচাপ বসেছিল| পরের সপ্তাহে চার্চে চেরিল বেকার আর আদিত্য রায়নার বিয়ে হয় | আর এমিলি রায়নার হয় নবজন্ম|" এতদূর বলে হঠাৎ একদম চুপ হয়ে যায় এমিলি|

কিছুক্ষণ অমিতাভও কোনো কথা বলে না|

তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এমিলি বলে, "এই দশটা বছর আমি জীবন থেকে মুছে ফেলতে চাই | তাই প্রত্যেক জন্মদিনে নিভিয়ে দিই দশটা মোমবাতি|"

৮

পিএইচ ডি শেষ হতে তখন ছ'মাস বাকি| ঘরে বসেই ফাইনাল ডিসার্টেশনের কাজ করত অমিতাভ | এরই মধ্যে আভার উপস্থিতি, মুড সুইং, ইমোশনাল ডিসঅর্ডার, হতাশা, কখনো উপবাস, কখনো অতিরিক্ত খাওয়া এইসব সামাল দেওয়াও একটা রুটিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল | রেবাও মেয়েকে সামলানোর জন্য অনেকটাই অমিতাভর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন| আভার Zach-এর উপর প্রতিহিংসার জন্যই যেন অমিতাভর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়ছিল| সময়ে অসময়ে যৌনসঙ্গম যেন ছিল আভার মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তির পথ| অমিতাভও ক্রমশ তাতে আসক্ত হয়ে পড়ছিল| এরই সঙ্গে চলছিল অমিতাভর প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের চিন্তা| কয়েক মাস পর পিএইচডি শেষ হলে চাকরি জোগাড় করতে হবে| তা না হলে ভিসার মেয়াদ শেষ, আমেরিকা থেকে ফিরে যেতে হবে দেশে | শ্রীতমার স্মৃতি এখনো তাকে পীড়া দেয়| দেশে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই| দেখতে দেখতে পিএইচডি ডিসার্টেশন জমা দেওয়া হয়ে গেল| থিসিস ডিফেন্ড করার দিন সকালে বেরোবার আগে রেবা দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বললেন, "বেস্ট উইশেস মাই সান!"

শুনে অমিতাভ একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল| মনে পড়ে গেল মায়ের মুখ আর পরীক্ষার আগে মায়ের দেওয়া দইয়ের ফোঁটা| থিসিস ডিফেন্ড করার সময় থিসিস কমিটির প্রত্যেক সদস্যের প্রশ্নের সঠিক উত্তর আর নিজের কাজ সম্বন্ধে তার মৌলিক জ্ঞান দেখে সসম্মানে অমিতাভর পিএইচডি অনুমোদিত হয়ে গেল| একজন কমিটি মেম্বার তাকে জিজ্ঞাসাও করল পোস্ট ডক্টরল রিসার্চ করার ইচ্ছা আছে কিনা এবং তার ভিসিটিং কার্ডও দিল অমিতাভকে|

ইউনিভার্সিটি থেকে সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে দেখে রেবা আর আভা মিলে ডাইনিং টেবিলে খাবার, শ্যাম্পেনের বোতল

আর কেক সাজিয়ে বসে আছে। দেওয়ালে একটা কাট আউটও ঝুলছে – 'ওয়েলকাম ডক্টর অমিতাভ বোস'। বিদেশেও অমিতাভ আজ যেন পরিবারের ছায়া দেখতে পাচ্ছিল। রেবা একটা টাই আর কাফলিং এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা আমার ভালবাসার একটা ছোট উপহার তোমার জন্য।"

অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া গল্পগুজবের পর অমিতাভ ঘরে এসে আলো নিভিয়ে গা এলিয়ে দিল বিছানায়।

পিএইচডি শেষ; স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদও শেষের পথে। নতুন চাকরি বা পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চের অফার তখনও হাতে নেই। চিন্তিত মুখে তাকে ঘরে বসে থাকতে দেখে রেবা স্নেহভরে অমিতাভর মাথায় হাত রেখে বললেন, "এত কীসের চিন্তা! আভা তোমাকে পছন্দ করে, ওকে বিয়ে করে নাও। তুমি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, আজ বাদে কাল কাজ পাবেই। মার্কিন সিটিজেনকে বিয়ে করলে তোমাকে ভিসা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।"

সারারাত জেগে ভাবতে থাকে কথাটা। আভার সাথে তার শারীরিক সম্পর্ক থাকলেও, সেইভাবে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়নি। আভাকে ডিপ্রেশন থেকে বার করার জন্য অনেক কিছুই করেছে সে, শারীরিক ডাকেও সাড়া দিয়েছে, তবে আজ আভাকে বিয়ে করাটা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু হবে না। এটা তো ম্যারেজ অফ কনভেনিয়েন্স হয়ে যাবে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আভাকে বিয়ে করতে চাওয়াটা সে একেবারেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না।

সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে চা আর টোস্ট নিয়ে বসে ভাবছিল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতেতে বসে আরো কিছু চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করবে। আভা ঘর থেকে বেরিয়ে তার সামনের চেয়ারে বসে অমিতাভর চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করে বসল, "তুমি আমাকে বিয়ে করবে অমিতাভ? তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ, আমি অনেক অত্যাচারও করেছি তোমার উপর, এবার তোমাকে আমার জীবনসাথী করতে চাই।"

অন্য ঘরের দরজায় তখন রেবা মুখে হাসি নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। অমিতাভ বুঝল তার দ্বিধা বুঝতে পেরে তার মা আভাকেই এগিয়ে দিয়েছেন। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল। আভা নিজে প্রপোজ করায় তার দ্বিধা কেটে গেল; বলল, "হ্যাঁ আভা, আমি বিয়ে করব তোমাকে।" রেবা ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন দুজনকে।

৯

প্রফেসর অমিতাভ বোসের পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ পেপার সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে সাড়া ফেলেছে। ইন্টারন্যাশানাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডাটা মাইনিং কনফারেন্স, লন্ডন থেকে গেস্ট স্পিকার হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ এসেছে। এটা এই সাবজেক্টের সব থেকে বড় কনফারেন্স। অমিতাভ ক্লাসে এই কথা জানাতেই সব ছাত্রছাত্রী আর সহকর্মীদের অভিনন্দনের বন্যা বয়ে গেল।

এমিলির মেসেজ, 'আমি ভীষণ গর্বিত তোমার জন্য, আরও আনন্দ হচ্ছে যে এই বছর কনফারেন্স আমার নিজের শহর, লন্ডনে হবে।'

কনফারেন্সের সময়টাও ভাল। ফল সেমিস্টার শুরু হওয়ার আগে কয়েক সপ্তাহ ছুটি থাকে আর এই সময়ে স্টুডেন্টরাও বাড়ি চলে যায়। পড়ানোরও কোনো চাপ থাকে না।

লন্ডনের অভিজাত সোফিটেল হোটেলে আগস্টের প্রথম সপ্তাহের উইকএন্ডে তিন দিনের কনফারেন্স। বৃহস্পতিবার রাতেই পৌঁছে গিয়েছিল অমিতাভ। পরদিন সকাল দশটা থেকে সেমিনার শুরু। ওয়েস্টমিনিস্টার স্যুইটে প্রায় দু'শ ডেলিগেটের সামনে দু'ঘন্টার সেশনে অমিতাভর এই আধুনিক বিষয়ের উপর অসাধারণ গবেষণামূলক কাজের বৃত্তান্ত সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। বক্তব্য শেষ হতে একের পর এক প্রশ্ন আর তার উত্তর দিতে দিতে আরো ঘন্টাখানেক কেটে গেল। এত উৎসাহ দেখে কনভেনর জানালেন, "এখন আমাদের লাঞ্চ ব্রেক। প্রফেসর বোস সেমিনারের তৃতীয় দিনে আবার আসবেন বাকি প্রশ্নের উত্তর দিতে।"

লাঞ্চরুমের দিকে এগোতে গিয়ে চোখ পড়ল হলের শেষে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমিলি। এমিলিকে দেখে উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরে উঠল অমিতাভর।

- "আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি আমাকে ফলো করে চলে এসেছ লন্ডনে!"

- "তুমি আমার শহরে এসেছ, আর আমি না এসে থাকতে পারি? আমি প্ল্যান করে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম লন্ডনের ঠিকানা দিয়ে। সিলেক্টও হয়ে যাই কপাল

জোরে, আর হাজির হয়ে গেলাম তোমাকে সারপ্রাইস দিতে।"
লক্ষ্য করল এমিলির বুকে স্টুডেন্ট ভলান্টিয়ারের ব্যাজ ঝুলছে।
- "চলো, লাঞ্চ করা যাক।"
লাঞ্চের পর এমিলি বলল, "আমি এবার পালাব। আর কারো লেকচার শোনার ইচ্ছা আমার নেই। তবে আমি তোমাকে আমার লন্ডন শহর দেখাব। বিকেল পাঁচটায় তোমার হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করব।"
সেমিনার থেকে হোটেলে ফিরে টাই, কোট, প্যান্ট থেকে মুক্ত হয়ে একটা বারমুডা, গার্ডেন প্রিন্ট টি-শার্ট আর ক্যাম্বিসের জুতো পরে লবিতে নামতে একটু দেরি হয়ে গেল অমিতাভর।
এমিলি তখন একটা ফ্রন্ট টাই ব্যাক ডেইজি ফ্লোরাল প্রিন্ট সানড্রেস পরে অস্থিরভাবে লবিতে পায়চারি করছে আর ঘড়ি দেখছে। এইরকম খোলামেলা ড্রেসে এমিলিকে কখনো দেখেনি অমিতাভ। পিছন থেকে গিয়ে গায়ে একটা টোকা দিতেই, ঘুরে দাঁড়িয়ে কপট রাগে এমিলি বলল, "আমি খুব রেগে আছি, অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলে তুমি, চলো এক্ষুণি।" এই বলে অমিতাভর হাতটা বগলদাবা করে টানতে টানতে লবি পেরিয়ে নেমে এল রাস্তায়।

সোফিটেল লন্ডন সেইন্ট জেমস হোটেলের আশেপাশে অনেক দ্রষ্টব্য জায়গা আছে। এমিলি দক্ষ গাইডের মতো একে একে ডিউক অফ ইয়র্ক কলাম, ক্রমেন ওয়ার মেমোরিয়াল, এডওয়ার্ড VII মেমোরিয়াল স্ট্যাচু, হের্ মাজেস্টি থিয়েটার, লন্ডন থিয়েটার দেখাতে দেখাতে পৌঁছাল ন্যাশনাল গ্যালেরির সামনে। এখানে ফোয়ারা আর জলের ধারে বসে বাচ্চা মেয়ের মতো অমিতাভকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি জানো না অমিতাভ, আমার নিজের শহরে তোমাকে পেয়ে আমার কত আনন্দ হচ্ছে।" অমিতাভ নিঃশব্দে উপভোগ করছিল উচ্ছল যৌবনের আবেগভরা উষ্ণতা। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে কাটিয়ে উঠে পড়ল তারা, হাত ধরে ঘুরে বেড়াল কাছেই সেইন্ট জেমস পার্কে। সন্ধ্যা হতে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল পিকাডেলি সার্কাসের দিকে। ঢুকে পড়ল বিখ্যাত কমেডি স্টোর লন্ডনে। সামনের সারিতে বসে স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ানদের শো দেখে হাসতে হাসতে জীবনের একটা স্মরণীয় সন্ধ্যা কাটিয়ে দিল অমিতাভ।
তারপর বেরিয়ে হোটেলের দরজায় পৌঁছে একটা গুডবাই কিস করে এমিলি বলল, "আজ আমাকে যেতে হবে, আমার বাবা অপেক্ষা করছে।"
অমিতাভ চাইছিল না আজকের সন্ধ্যাটা শেষ হোক।
- "কাল দুপুরের পর সেমিনার সেশন নেই, চলে এসো হোটেলে, একসাথে লাঞ্চ করা যাবে।"
- "ওকে, আসব আমি।" ছোট্ট জবাবটা দিয়ে, একটা রহস্যময় দৃষ্টি ফেলে চলে গেল এমিলি।
শনিবার সকালে সেমিনারেই ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রযুক্তিগত আলাপ আলোচনার পর বারোটার সময় সেমিনার শেষ।
হোটেলে ফিরে এমিলির জন্য অধীর অপেক্ষায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে দাঁড়িয়ে গেল অমিতাভ। বেশ কিছু রূপোলি চুল, আর বয়স্ক পরিণত চেহারার মধ্যে খুঁজতে থাকল নিজের যৌবনের চেহারা। যুক্তি খুঁজতে লাগল উদ্ভিন্ন যৌবন তরুণী এমিলির জন্য তার এই মানসিক অস্থিরতার। ইন্টারকম বেজে উঠতে তড়িঘড়ি ফোন তুলে নিল। রিসেপশন থেকে জানাল, "এমিলি নামে একজন মহিলা অতিথি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"
- "প্লিজ পাঠিয়ে দিন আমার ঘরে।"
ডোরবেল বাজতে দরজা খুলে দেখে এমিলি একটা স্প্যাঘেটি স্ট্র্যাপ ভি নেক নীল ড্রেসে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত অমিতাভর মুখে কোনো কথা এল না, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অমিতাভ। মৃদু হেসে চোখের সামনে হাত নাড়িয়ে এমিলি বলল, "হ্যালো, ভিতরে আসতে বলবে না দরজাতেই দাঁড় করিয়ে রাখবে?"
ঘোর কাটতে লজ্জিত হয়ে বলল, "আরে এসো এসো।"
দরজা বন্ধ করতেই ক্যালভিন ক্লাইন পারফিউমের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সেলার থেকে একটা মার্টিনি অ্যান্ড রোসি এসটি স্পার্কলিং হোয়াইট ওয়াইন আর দুটো ওয়াইন গ্লাস নিয়ে বসল অমিতাভ এমিলির পাশে। ছোট কাউচে পাশাপাশি বসে ওয়াইনে চুমুক দিয়ে হাসি, গল্প, মস্করা করতে করতে এমিলির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, পারফিউমের গন্ধ আর ওয়াইনের মাদকতা যেন অমিতাভর সব পরিশীলতা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সরিয়ে দিল। এমিলিকে টেনে নিল নিজের বুকে। এমিলি যেন তৈরিই ছিল নিজেকে সমর্পণ করতে। স্থান, কাল, নৈতিকতা ভুলে উদ্দাম মিলনের পর ক্লান্ত হয়ে এমিলির বিবস্ত্র বুকে মাথা রেখে অমিতাভর অনুচ্চ

স্বরে স্বগতোক্তি শোনা গেল, "আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি শ্রীতমা।"

এমিলির কান অবধি অবশ্য পৌঁছাল না শ্রীতমার নামোচ্চারণ। বাকি দুপুরটা হোটেলের সুইমিং পুলের ধারে লাইট লাঞ্চ আর ওয়াইন নিয়ে কাটিয়ে দিল ওরা। কথা তখন কমে গেছে। অনেক না বলা কথাই যেন বলা হয়ে গেল অলস দুপুরে হাতে হাত আর চোখে চোখ রেখে।

এমিলি কথা দিয়েছিল তাকে লন্ডন শহর দেখাবে। একটু রোদ পড়লেই তারা বেরিয়ে পড়ল। লন্ডন আই রিভার ক্রুজে টেমস নদীর উপরে ভাসতে ভাসতে লন্ডন আই, ওয়েস্টমিনিস্টার প্যালেস, টাওয়ার ব্রিজ, আর লন্ডন সিটি স্কাইলাইনের অসাধারণ দৃশ্য, খোলা হাওয়া, সূর্যাস্তের শেষ আলোর লাল আকাশ, এমিলির উড়ে আসা অবিন্যস্ত চুলের স্পর্শ অমিতাভর জীবনে এক মোহময়ী সন্ধ্যা উপহার দিল।

পাড়ে ফিরে ওরা লন্ডন আই এ চড়ে দেখল আলোকোজ্জ্বল লন্ডন শহরটাকে। এরপর টেমসের পাড়ে 'গ্রেট ব্রিটিশ ফিশ অ্যান্ড চিপস' থেকে ট্র্যাডিশনাল ফিশ অ্যান্ড চিপস নিয়ে বেশ খানিকটা সময় কাটাল ওরা। কাল আর সুযোগ হবে না এমিলির সাথে দেখা করার। বাবা, আদিত্যও অনেকদিন পর পেয়েছেন মেয়েকে। ওরা কয়েকদিনের জন্য স্কটল্যান্ডে বেড়াতে যাবে কাল। গাঢ় আলিঙ্গনে বিদায় জানিয়ে হোটেলে ফিরে গেল অমিতাভ।

সানডে সেমিনারের শেষদিনে সারা সকাল কারিগরি পর্যালোচনা আর প্রশ্নোত্তরের পর অফিসিয়াল ক্লোসিং লাঞ্চ। সেমিনার অর্গানাইজাররা ব্যবস্থা করেছিল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট স্টোনহেঞ্জ ট্যুরের। পৃথিবী-বিখ্যাত, প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ দেখে ফিরে তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে ছুটল হিথরো এয়ারপোর্টে। রাত্রের ফ্লাইট লন্ডন-নিউয়র্ক-পিটসবার্গ। সকালে বাড়ি ফিরে বেল বাজাতে দরজা খুলে দিল আভা। সহাস্য মুখে বলল, "ওয়েলকাম ব্যাক হোম। ফ্রেশ হয়ে এসো, আমি ব্রেকফাস্ট রেডি করছি।"

১০

শহরে ফিরে কাজে ডুবে গেল অমিতাভ। পড়ানোর পাশে ইন্ডাস্ট্রির সাথে যোগাযোগ তৈরী করতে হয় রিসার্চ ফান্ড জোগাড় করার জন্য। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ড্রোন টেকনোলজি, ড্রাইভারবিহীন গাড়ি এইসব কাটিং এজ টেকনোলজির জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা রিসার্চে অনেক ইনভেস্টমেন্ট করে বটে, তবে এই ইনভেস্টমেন্ট পাওয়ার জন্য প্রজেক্ট তৈরী করতে হয় প্রফেসরদের।

অনেক রিসার্চ স্কলার তার কাছে কাজ করে, আর তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই রিসার্চ ফান্ডিংয়ের উপর।

ওয়ান অক্সফোর্ড সেন্টার ANI ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট কম্পানি অফিসে রিসার্চ ফান্ডিং-এর জন্য প্রেসেন্টেশন করতে গিয়ে অমিতাভর আলাপ হ'ল ইন্ডিয়ান ইনভেস্টর অনির্বাণ চ্যাটার্জীর সঙ্গে। বোর্ডরুমে প্রেসেন্টেশন শেষ হলে অনির্বাণ এগিয়ে এসে বলল, "আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি আজ চাক্ষুষ আলাপ হ'ল। আমি খুব ইন্টারেস্টেড আপনার প্রজেক্টে তবে আমার পার্টনারের অ্যাপ্রুভাল লাগবে। আমি যদিও জানি আপনার নাম শুনলেই প্রজেক্ট ফান্ডিং অ্যাপ্রুভড্ হয়ে যাবে।" এই বলে রহস্যময় একটা হাসি হেসে করমর্দন করে অমিতাভকে এগিয়ে দিল বোর্ডরুমের দরজা পর্যন্ত।

দু'সপ্তাহের মধ্যে অমিতাভর কাছে চিঠি এল রিসার্চ ফান্ডিং অ্যাপ্রুভালের। পরবর্তী তিন বছর এই প্রজেক্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, আর বেশ কিছু রিসার্চ ফেলোদের গ্র্যান্ট দেওয়ার ব্যবস্থা হতে অমিতাভ অনেকটা চাপমুক্ত হ'ল। মনে মনে খুশিও হ'ল, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করা এমিলিকে এই প্রজেক্টে রিসার্চ করার সুযোগ দিতে পারবে।

দেখতে দেখতে একাডেমিক সেশন শেষ। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পেটারসন ইভেন্ট সেন্টারে কনভোকেশন, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে সাজ সাজ রব। আজ একটা বিশেষ দিন। অমিতাভকে আউটস্টান্ডিং পোস্ট ডক্টরাল ফেলো অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে তার রিসার্চ এক্সেলেন্স আর অন্যান্য ক্রিয়েটিভ কাজের জন্য। এমিলি রায়নারও আজ পোস্ট গ্রাজুয়েট অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি স্কুল অফ কম্পিউটিং অ্যান্ড রিসার্চ থেকে। সারাদিন ফর্মাল কনভোকেশন গাউন পরে অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি শেষ হওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে অমিতাভ। সন্ধ্যাবেলা আবার অভিজাত ফেয়ারমন্ট পিটসবার্গ হোটেলে ANI ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের ইনভিটেশনে যেতে হবে ডিনার অ্যান্ড ককটেল পার্টিতে। ইনভেস্টররা পরিচিত হতে চায় প্রজেক্ট গ্রুপের সাথে। আভাও আমন্ত্রিত।

চারকোল কালার ডার্ক স্যুট, সাদা শার্ট, কালো ড্রেস শু আর বো টাই পরে তৈরী হতে একটু দেরিই হয়ে গেল অমিতাভর। আভা একটা বার্গেন্ডি জুয়েল নেক শর্ট স্লীভ ইভনিং ড্রেস পরে তৈরী হয়ে গেছে তার আগেই। ফেয়ারমন্ট বলরুমে পৌঁছে দেখে বাকি আমন্ত্রিতরা সবাই এসে গেছে। দূর থেকে অনির্বাণ চ্যাটার্জী অমিতাভকে দেখতে পেয়ে সজোরে চেঁচিয়ে ওঠে, "এসে গেছেন, আর্কিটেক্ট অফ আওয়ার ইনোভেটিভ প্রজেক্ট – প্রফেসর অমিতাভ বোস।" এই বলে এগিয়ে এসে অমিতাভকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় আর অভিবাদন করে আভাকেও। আসুন আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল গ্রুপের পার্টনার আর আমার লাইফ পার্টনার শ্রীতমা চ্যাটার্জীর সঙ্গে। নামটা শুনে থমকে যায় অমিতাভ।

অনির্বাণ লোকজনের ভিড় কাটিয়ে, অমিতাভ আর আভাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় শ্রীতমার সামনে। অমিতাভ বাকরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে শ্রীতমার দিকে। শ্রীতমা খুব স্বাভাবিকভাবে অমিতাভকে আর আভাকে অভিবাদন জানিয়ে আলাপ করিয়ে দেয় উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে। অমিতাভও ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে এমিলি আর বাকি রিসার্চ স্কলারদের আলাপ করিয়ে দেয় সবার সঙ্গে। এর পর ককটেল ডিনার আর ওয়াইনের পর শুরু হয় লঘু আলাপ।

একটা স্ট্যান্ডিং টেবিলের কাছে অমিতাভর কাছাকাছি এসে লঘুস্বরে শ্রীতমা গল্প করতে শুরু করে, "আমি কিন্তু অপেক্ষা করেছিলাম অমিতাভ, এখনও শেষ হয়নি সেই অপেক্ষার, এখন আর ত্রিবেণী নয়, এই শহরেই আছি আমি তোমার কাছাকাছি।" এই বলে একটা অর্থপূর্ণ গভীর দৃষ্টি আর বাঁকা হাসিতে বিচলিত করে দেয় কিছুটা নেশাগ্রস্ত অমিতাভকে। "তুমি এখন আমাদের ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টের ডিরেক্টর। আমার কাছে আছে তোমার নম্বর।"

সেই মুহূর্তে এমিলিও চলে আসে টেবিলে, অমিতাভর খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, "আমি ভাগ্যবান এই প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আর তোমাকে আমার ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড হিসাবে পেয়ে।"

একটু বাদে আভাও এসে দাঁড়ায় টেবিলের পাশে; অমিতাভর আপাত বেচাল অবস্থা দেখে সে বলে, "অনেক দেরি হয়ে গেছে অমিতাভ, চলো গাড়িতে ওঠো, বাড়ি যাই আমরা।"

এক মুহূর্তে যেন অমিতাভর জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের ত্রিধারা ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলে গেল স্বমহিমা নিয়ে। স্বভাববিরুদ্ধ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অমিতাভ জীবন থেকে বেরিয়ে নিজের জীবনটাকেই দেখতে থাকল। জীবন সায়াহ্নে ত্রিধারা সঙ্গমে অবগাহন, শ্রীতমা, আভা, এমিলি যেন অ্যালেঘেনি, মননগাহেলা, আর ওহাইও এই তিন নদী আলাদা আলাদা রঙ-রস-রূপ নিয়ে মিলে গেছে তার জীবনে।

আভা ড্রাইভ করে নিয়ে এল বাড়িতে। কোনোরকমে জামাকাপড় বদলে ঘুমোতে যাওয়ার আগে দৈনন্দিন অভ্যাসমতো সেলফোন বন্ধ করতে গিয়ে চোখে পড়ল নীল স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে দুটো মেসেজ শ্রীতমা আর এমিলির। মেসেজগুলো না পড়েই দুটো লাভ ইমোজি পাঠিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অমিতাভ।

শিল্পী: সফিক আহমেদ

বুনো সুবাস

কৃষ্ণা গুহ রায়

বর্ষিয়ান চিত্রশিল্পী অনিমেষ মুখোপাধ্যায় | জীবনে অভিজ্ঞতার ভান্ডার এখন প্রায় পরিপূর্ণ | তবু শিল্পী মন কোথাও যেন কিছু খুঁজে বেড়ায় | তিনি পুরনো কলকাতার এক তিন কামরা ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দা | একটা ঘর তাঁর স্টুডিও | সঙ্গে থাকে ছোট ভাই দীপেশ, তিনিও বিয়েথা করেননি | সরকারী চাকরি করতেন, এখন রিটায়ার্ড | ওঁদের দেখাশুনা করবার জন্য বাড়িতে রয়েছে একটি বিধবা কাজের মেয়ে, নাম তার সন্ধ্যা | সন্ধ্যার দুই মেয়ে, তারা স্কুলে পড়ে | তাদের পুরো পরিবারের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এই দুই ভাই |

প্রায়ই বিশিষ্ট গুণীজনের আবির্ভাব ঘটে এই ফ্ল্যাটে | অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে চলতে থাকে চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী | অনিমেষ মুখোপাধ্যায়ের আঁকার একটাই বিশেষত্ব যে উনি একটা রঙের ব্যবহার করেন এবং সেটা হ'ল কালো | কালো রেখার আঁচড়ে বুঝিয়ে দেন তাঁর ছবির সারমর্ম | বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে এমনকি ইংরেজি বিদেশী সংবাদপত্রেও তাঁর এই আঁকা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা মাঝেমাঝেই বেরোয় | পঁচাত্তর ছুঁই ছুঁই অনিমেষ মুখোপাধ্যায়কে দেখলে বোঝা যায় এককালে খুবই সুপুরুষ ছিলেন | ছয় ফুটের উপর লম্বা, মাথাভর্তি চুল, টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, তাঁকে দেখে আর্য সমাজের অন্যতম প্রতিভূ বলেই মনে হয় | কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় কোনকালেই ঠাকুর দেবতা মানতেন না তিনি | ব্রাহ্মণ হয়েও পৈতেটুকুও পরতেন না | কিন্তু তাঁর সৌম্যকান্তি চেহারা বুঝিয়ে দিত তিনি উচ্চবংশের মানুষ | ঢোলা পাজামা পাঞ্জাবী পরে, কাঁধের ব্যাগে আঁকার জন্য কাগজ রং তুলি নিয়ে ভরা যৌবনে ঘুরে বেড়াতেন ভারতের বিভিন্ন গ্রামে | ব্রাহ্মণ যুবককে আশ্রয় দিতে সবাই খুব উৎসাহ বোধ করতেন | কাজেই যেখানেই যেতেন থাকা-খাওয়ায় তাঁর কখনো অসুবিধা হতো না | ভাল লাগলে কোনও গ্রামে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস থেকে যেতেন | আবার কোথাও একরাত্রি বা দুরাত্তির থেকেই প্রস্থান করতেন |

ভরা যৌবনে মানুষ পালতোলা নৌকার মতো | ইচ্ছে হলে অনায়াসে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া যায় | অনিমেষও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না | এখন সত্তরোর্ধ্ব বয়সে বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোন না | মাঝে মাঝে কিছু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে যেতে হয় | আর আর্ট গ্যালারিতে নিজের আঁকার প্রদর্শনী থাকলে সন্ধ্যের দিকে একটু ঘুরে আসেন | কলকাতার এক নামী সংবাদ সংস্থা কিছুদিন আগে তাঁকে ফোন করেছিল তাঁর আত্মজীবনী লেখার জন্য |

জীবনের চিত্রময় অভিজ্ঞতা সাদা কাগজে কালো অক্ষরে লিখতে থাকেন অনিমেষ | ছেলেবেলার কত কথাই তো মনে পড়ে | একের পর এক তা লিখে চলেন |

স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর যখন তিনি সরকারী আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন | মনের মধ্যে তখন একরাশ স্বপ্ন | পড়াশোনার দিকে আর না গিয়ে সোজা আঁকতে চলে যাওয়া সে সময় রাশভারী বাবার কাছে খুবই আপত্তিকর ছিল | বলা যায় মায়ের প্রশ্রয়ে অনিমেষ আঁকার কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন | দুচোখে তখন স্বপ্ন – পিকাসো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি!

মনে পড়ে ন্যুড ছবি আঁকার কথা | আগেই শুনেছিলেন সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়ে মডেলের ছবি দেখে আঁকতে হবে | আগের দিন সারারাত ঘুমোতে পারেননি | রানাঘাট থেকে বৃদ্ধা লীলামণি তাঁর নাতনিকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন করে আসতেন | এক সময় লীলামণিও এই কলেজের ন্যুড মডেল ছিলেন | এখন ঊনিশ বছরের তরতাজা যুবতী নাতনি, ডালিয়া সেই দায়িত্ব নিয়েছে | এতগুলো চোখের সামনে সে তার বিবস্ত্র শরীরটাকে মেলে ধরত, যা সাদা কাগজে কোলাজ হয়ে থাকত | ডালিয়া যা রোজগার করত পুরো টাকাটাই তার অভাবের সংসারে কাজে লাগত |

কাগজে লিখতে লিখতে অনিমেষের হঠাৎ ডালিয়ার চোখদুটো মনে পড়ল | তখন সে অনুভূতি না থাকলেও, এখন বোঝেন কতখানি অসহায় হলে একটা মেয়ে এতগুলো মানুষের সামনে বিবস্ত্র হবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে |

প্রতিটা সৃজনশীল মানুষের মধ্যেই থাকে বিভিন্ন রকম স্বপ্ন | ঘটনাবহুল জীবনে একেকটা টুকরো ফুটে ওঠে তাদের শিল্পকর্মে | অনিমেষও এর ব্যতিক্রম নন | বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্কশপ করতে গিয়ে কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে |

জীবনের বৈচিত্র্য ফুটে উঠত তাঁর শিল্পকর্মে। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে, পাজামা পাঞ্জাবী পরে, একগাল দাড়ি নিয়ে তখন তিনি পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতেন। গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে একবার এক সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

প্রাচীনকাল থেকেই সাঁওতালরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে নদীর ধারে, বিশাল বৃক্ষের তলায় শিলাখন্ড স্থাপন করে দেবতা জ্ঞানে আচার অনুষ্ঠান করত। ধর্মীয় উৎসবে মাদল আর ধামসার শব্দে সাঁওতালী নৃত্যের ছন্দে মেতে উঠত বনাঞ্চল। সেসময় আদিবাসীদের নৃত্যগীত দেখতে ভিড় জমাত রাজার সৈন্যবাহিনীর লোকেরা। বাংলার মসনদে তখন নবাব আলিবর্দী খাঁ। সেই সময় বারবার বর্গী হানায় বিধ্বস্ত বাংলা। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজনও বর্গীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। স্থানীয় জায়গীররা এদের বীরত্বে খুশী হয়ে নদীর ধারে বেশ কয়েক একর জমি দান করলেন। সেখানেই তারা বসতি গড়ে তুলল।

বাঁকুড়ার কাছে সেরকমই এক সাঁওতাল গ্রামে অনিমেষ এলেন। গ্রামের পুরুতমশাই তাঁকে দেখে নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। নাম ও পরিচয় শুনে পুরুতমশাই বুঝেছিলেন অনিমেষ উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। পরদিন একটি সাঁওতাল যুবকের বিয়ে। অনিমেষ ভাবলেন সাঁওতাল বিয়েতে তাদের সমস্ত রীতিনীতি দেখবেন। মহুয়া ফুলের রস খেয়ে মাতাল হবেন।

বিয়েতে সাঁওতালী মেয়েরা বাড়ির উঠোনে নানা রঙের আলপনা আঁকে। আলপনা আঁকার সময় এরা গান গাইতে থাকে –

‘মিন্দে কর মাতল পিয়া
সিতলিয়া আনানে
নিদো নাহি এ পিয়া
আয় আধার রাতিয়া করে কর বাজু আখে
গর এ খর বাজু আখে
কে যে কলি লে লাই পিয়া
আয় আধার রাতিয়া
নিদো নাহি পিয়া
আয় আধার রাতিয়া
ডারাকর পিছু আখে
পিছু আখে ডার আখর
ছো আখে কে যে খলিলে
লাই পিয়া আয় আধার রাতিয়া
নিদ নাহিরে পিয়া
আয় আধার রাতিয়া।’

পুরোহিত সেই গানের মানে বুঝিয়ে দিলেন – অনেক রাত করে ঘুমিয়েছি বিয়েবাড়িতে, আর কে, যে পায়ের নূপুরটা নিয়ে নিল, তা জানি না। আবার চোখে ঘুমও নেই। কে যে কোমরের বিছাটা নিয়ে নিল খুলে, তাও জানি না...।

সেই সুরের রেশ অনিমেষকে চঞ্চল করে তুলল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনিও চললেন বিয়ের মন্ডপে। সাঁওতালী রমণীরা সুন্দর করে সেজেছে, খোঁপায় গুঁজেছে ফুল। যুবকদের মাদলের তালে তালে তারা নেচে চলেছে। অনিমেষের মনের মধ্যেও তার অনুরণন শুরু হ’ল।

অতঃপর কনেকে এনে উঠোনে বসানো হ’ল। পুবদিকে মুখ করে, নিয়ম মেনে কনের একপাশে বসে বরের ভাই, অন্য পাশে কনের ভাই। সবার উপস্থিতিতে এরা একজন অন্যজনের বুকে পানপাতা ছোঁয়াল। এরপর একে অন্যকে বিয়াই বলে সম্বোধন করে বিটবিট (কোলাকুলি) করল। চারপাশে তখন ঢোল-মাদলের বাজনা বেজে উঠল। কনে দাঁড়িয়ে সবাইকে প্রণাম করল।

অনিমেষ তখনও জানতেন না কী হতে চলেছে। ওখানকার প্রথা অনুযায়ী বাসর রাতে কনেকে প্রথম সম্ভোগ করবেন কোনও এক ব্রাহ্মণ যুবক, যাতে ব্রাহ্মণের ঔরসে নতুন কনের গর্ভে প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। বাসর ঘরে অনিমেষকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হ’ল। মহুয়ার নেশায় তখন তার ঢুলুঢুলু অবস্থা! সাঁওতাল রমণীর নিটোল শরীরের ছোঁয়া লাগল অনিমেষের শরীরে। যে কোনও পুরুষের পক্ষেই এই আবেদন অগ্রাহ্য করা খুব কঠিন। অনিমেষও এর ব্যতিক্রম নন। সেই রাতে নববধুর সঙ্গে শরীরী খেলায় মাতলেন অনিমেষ।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। পুবের আকাশ তখন সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে। জঙ্গলে পাখিদের কিচির মিচির শব্দ ভোরের পরিবেশকে আরও মোহময় করে তুলেছে। ভরা যুবতী নগ্ন শরীরে অনিমেষকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে জামাকাপড় পরে

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গ্রামের পুরোহিতমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে তক্ষুনি গ্রাম ছাড়লেন। পেছনে পড়ে রইল বন্য রমনীর বুনো সুবাস।

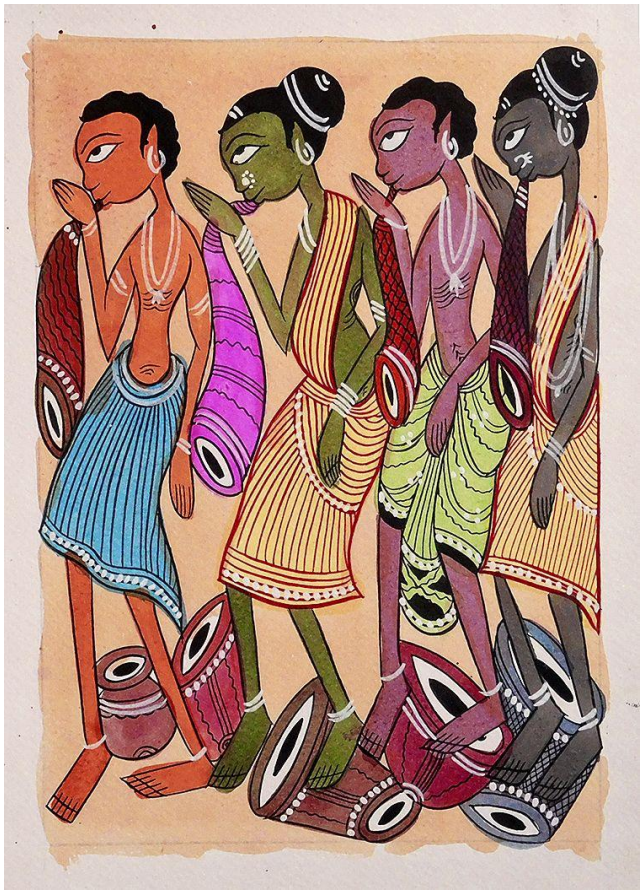

মেক-আপ আর্টিস্ট

হুসনে জাহান

- "**ক**নে তো বেশ ধপধপে ফর্সা রে নিরু!"

- "নারে, নাঃ! এই যে তোর পাশে দাঁড়ানো মেয়েটার হাতের রঙ, ঠিক ওরকমই ওর গায়ের রঙ।" তেছরা চোখে পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির হাতের দিকে ইশারা করে নিরু জবাব দিল – "কনে ওরই বোন, ওর মতই গায়ের রঙ। এসব পার্লারের কারিগরি।"

স্টেজেবসা কনে আর পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে কয়েকবার তাকিয়ে দুজনের গায়ের রঙের তারতম্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কনে একেবারে দোকানে সাজানো নির্জীব ও কৃত্রিম ম্যানেকিনের মতো। এটাই হচ্ছে আজকালকার পার্লারে বিয়ের কনের মেক-আপ, যা কনেকে চুনকাম করা দেওয়ালের মতো সাদা বানিয়ে দেয়। তার সাথে ভুরু, কৃত্রিম চোখের পাতা, আর ডগডগে লাল রঙ করা মোটা ঠোঁট, সব মিলিয়ে যেন মনে হয় মঞ্চেবসা এক পুতুল।

আমাদের এক আত্মীয়ের ছেলে বিলেতি বৌ নিয়ে দেশে এল। তার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখি স্টেজের ওপর এক শাড়ীপরা, চকমাখা ভাবলেশহীন সাদা চেহারার কনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। চিন্তা করছিলাম কীরকম বিদেশী মেয়ে বিয়ে করেছে! এর দুদিন পর নববিবাহিতার শ্বশুরবাড়িতে দেখা করতে গিয়ে সাধারণ বেশে, মেক-আপ ছাড়া মিষ্টি চেহারার একটি মেয়েকে ঘোরাফেরা করতে দেখে আমি তো চিনতেই পারিনি যে এই-ই সেই রাতের কনেবেশী মেয়ে। সাধারণ পোশাকপরা, স্বাভাবিক চেহারার এই মেয়ের সাথে তো সে রাতের কনের কোনো মিলই নেই! খুবই অবাক লাগল একই মেয়ের চেহারার এতখানি অসামঞ্জস্য দেখে। ভাবলাম এই বিদেশিনীই বা কী আক্কেলে পার্লারে গিয়ে ওরকম সাদা ভূতের মতো চেহারা বানাতে রাজি হ'ল! আহা, বেচারি, বিদেশিনী! কী আর করবে? অচেনা শ্বশুরবাড়ির পরিবার অসন্তুষ্ট হবে মনে করে হয়তো মুখ ফুটে কোনো মতামত প্রকাশ করার সাহস করেনি।

আজকাল দেখা যায় শহরের সব বিয়েতে এভাবেই

সবাই পার্লারে গিয়ে কনের আসল চেহারা বেমালুম পাল্টিয়ে স্বামী-শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও হলভর্তি নিমন্ত্রিতদের সামনে মঞ্চে না বসাতে পারলে যেন বিয়ের এক প্রধান কাজই বাদ পড়ে যায়; তার জন্য যত খরচই হোক না কেন! এখানে আমার মনে প্রশ্ন ওঠে যে বিয়ের পর আজীবন যখন বৌ মেক-আপ ছাড়া নিজের আসল চেহারা নিয়ে চলাফেরা করে, তখন তার ও সবার মনের প্রতিক্রিয়া কীরকম হয়? অবশ্য যদি বর ও বধূ পূর্বপরিচিত হয়ে থাকে সেখানে এ ব্যাপারে সমস্যা হবার সম্ভাবনা কম। এই পুতুলখেলাটা যদি শুধু নিমন্ত্রিতদের সামনে একদিনের জন্য ভিডিও ও ফটো তোলার কারণে, বা কাগজে, বিউটি ম্যাগাজিনে ছাপানোর প্রয়োজনে সজ্ঞানে করা হয়, তাহলে একদিনের রাজকন্যা সেজে সবার প্রশংসা শুনতে হয়তো ভালই লাগে। যেখানে বর-বধূ অপরিচিত, সেখানে রূপ বদলানোর ফলাফল সম্বন্ধে আমার সঠিক কোনো ধারণা নেই। তাই আমার মতে বিবাহোত্তর ঝামেলা এড়ানোর জন্য নিজের স্বাভাবিক চেহারা সামান্য রুচিসম্মত প্রসাধনীতে সাজিয়ে নিলেই তো সব দিক রক্ষা হতে পারে। তবে সবাই যে আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হবেন, তা আমি আশা করি না।

আমাদের ছোটবেলায় স্নানের সময় সাবান দিয়ে শরীর ধুয়ে-মুছে, স্নো বা পন্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে, চুল আঁচড়িয়ে খুলে রেখে বা বেণী বেঁধে নিলেই রোজকার ঘরোয়া সাজ সম্পন্ন হতো। আর বিকেলে গা ধোবার পর ঘাড়ে গলায় ট্যালকম পাউডার মেখে নেওয়া। বাইরে বেরোবার আগে ওই একই – মুখে-ঘাড়ে একটু স্নো মেখে, অতি সযতনে তুলে রাখা ফেস পাউডার পাফের হালকা একটা পরশ বুলিয়ে, চোখে কাজল অথবা সুরমা টেনে, ইচ্ছে হলে কপালে একটি টিপ এঁকে নিলেই ব্যস, আমাদের মেক-আপ শেষ। আমাদের শরীর ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্যই মা বেশী নজর দিতেন। দুপুরে স্নানটা করতেই হবে। আর বিকেলেও গা-ধুয়ে ঘরোয়া প্রসাধন সেরে, ধোয়া কাপড় পরে আত্মীয় বা বন্ধুদের বেড়াতে আসার অপেক্ষায় অথবা কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। কিছু না হলে অন্ততঃ বারন্দায় বা ছাদে একটু ঘোরাফেরা করতাম। আরেকটু বড় হয়ে বিদেশ থেকে আমদানি কম্প্যাক্ট পাউডারের আকর্ষণীয় কৌটো খুলে তার পাতলা পাফটা মুখে ও গলায় ছোঁয়াতে পারলে আর কী চাই! ফাউন্ডেশন ও লিপস্টিকের সাথে পরিচয় আরো অনেক পরে। তবে ওসব দামি রঙ চং ব্যবহার হতো শুধুমাত্র উৎসব, অনুষ্ঠান এবং বিশেষ গন্তব্যের প্রাক্কালে।

কলেজের পড়া শেষ হবার বছরই আমার বাবা মা তাঁদের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে লন্ডনবাসী এক উচ্চশিক্ষাভিলাষী পাত্রের হাতে তুলে দিলেন। বিবাহের পর স্বামীর ইচ্ছায় আমার সাজগোজে কিছু রঙ চড়াবার প্রয়োজন হলে আমার মেক-আপ শিল্প কারিগরি স্কুল লেভেল থেকে কলেজ লেভেলে পৌঁছে গেল। চাকরির প্রথম পর্যায়ে এই কলেজ লেভেলের সাজগোজেই আমি তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে চাকরির কারণে নতুন প্রতিষ্ঠানে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত হয়ে স্টাইলিশ সহকর্মী ও বান্ধবীরা তাঁদের মতো আরো কিছু রঙিন প্রসাধনী ব্যবহার করিয়ে আমার স্বাভাবিক চেহারা আকর্ষণীয় করে তোলায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ফলে ঠোঁট ও নখ রঙিন করা, গালের লালিমা বৃদ্ধি, কালো পেন্সিল টেনে চোখ ও ভুরু ঘন কালো করা এবং অনেক অধ্যবসায়ে আড়াই ইঞ্চি হিলের জুতো পরে হাঁটার অভ্যেস করা, এ সবই একে একে রপ্ত করে সাজগোজ ও প্রসাধনী বিদ্যায় গ্রাজুয়েট লেভেলে প্রবেশ করলাম। কালের গতিতে এভাবেই স্বামীর ইচ্ছা পূরণের তাগিদ থেকে শুরু করে সৌখিন সহকর্মীদের প্রভাবে আমার ব্যক্তিগত সাজগোজের মান ক্রমশঃ উপর দিকেই উঠতে থাকল।

এই সবটা আমার সহজ সরল পাড়াপড়শি ও বন্ধুমহলের নজর এড়াল না। আমার চেহারার বাহ্যিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ আমার সাজানোর পারদর্শিতার ওপর তাদের আস্থা বেড়ে গেল। ফলে পাড়ায় আমার ছোটবেলার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী এবং কলেজের এক সহপাঠীর যখন পিতৃগৃহ থেকে বহিষ্কৃত হবার সময় এল, তাদের গুরুজনরা কন্যাদের সাজানোর ভার আমার হাতেই অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাজেই আমার দুই বান্ধবীর স্বামীগৃহে যাত্রার প্রারম্ভে সৌন্দর্য বৃদ্ধির দায়িত্বভার আমাকেই বহন করতে হ'ল। যাইহোক, আমার প্রসাধনী বিদ্যা তাদের চেহারায় উজাড় করে তাদের বিদায়-মঞ্চে উপস্থিত করতে সাহায্য করলাম। মনে হ'ল এটা আমার সাধারণ মেক-আপ শিল্পের যোগ্যতার সত্যিকার পরীক্ষা হ'ল। আমি দুজন সুন্দরী কনেকে মনের মতো সাজিয়ে সবার প্রশংসা শুনে মনে করলাম এবার তাহলে মেক-আপ শিল্পে কলেজ লেভেলের

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম | তবে সত্যি বলতে কি – এ শিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করার উচ্চাভিলাষ আমার মোটেই ছিল না | চাকরি, সংসার, সন্তান পালন করে সুরুচিসম্পন্ন সাজগোজের বেশী কিছু করার সময় ও লক্ষ্য আমার ছিল না | কিন্তু দৈবের বিধান কেউ কি এড়াতে পারে? তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অযাচিত দায়িত্ব বার বার আমার ঘাড়ে চেপে মেক-আপ শিল্পে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে লাগল | উচ্চশিক্ষার জন্য এবং বিদেশে চাকুরিরত স্বামীর সহধর্মিণী হিসাবে প্রায়ই দেশের বাইরে অবস্থান করতে হয় | সরকারী ও সামাজিক মেলামেশা ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করে অন্যান্য সুসজ্জিত মহিলাদের মতো নিজের প্রসাধনের মাত্রাও তাই ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেতে লাগল | অবসর সময়ে বড় বড় নামী দামী দোকানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করার অভ্যাসও হ'ল | যার ফলে তাদের বিক্রির ফাঁদে পড়ে স্যাম্পল প্রসাধনীর গিফট ব্যাগের নতুন সামগ্রী পেয়ে সেসব ব্যবহারের কিছু বদ অভ্যাসও হয়ে গেল | এভাবেই প্রসাধনী শিল্পের আইলাইনার, মাস্কারা, আইশ্যাডো আমার আয়নার সামনে স্থান করে নিল | তবে চোখে কৃত্রিম পাপড়ি লাগানো থেকে আমি সব সময় তফাতে থেকেছি |

এর কয়েক বছর পর আমাদের পরিবারে আমার উন্নত প্রসাধনী বিদ্যার আর একটা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হ'ল | আমার ছোট বোনের বিয়ের কথা পাকা হলে আদরের বোনটি আবদার ধরল যে আমি যেন নিজে হাতে তাকে বিয়ের সাজে সাজিয়ে দিই | সে সময় শহরের বড় দুটো হোটেলে মেয়েদের সাজানোর পার্লার চালু হয়েছে | কিন্তু পার্লারের একঘেয়ে কৃত্রিম চেহারা আর তখনকার ফ্যাশন অনুযায়ী চুল ফুলিয়ে বুফোঁ বাঁধার প্রচলন আমার বোনের দারুণ অপছন্দ | তার কোঁকড়া চুল সে স্বাভাবিকভাবে আলতো খোঁপা বেঁধে রাখতে চায় | একটু চিন্তায়ই পড়লাম | অনাত্মীয়দের বেলায় তো গোঁজামিল দিয়ে পার পাওয়া যায় | কিন্তু নিজের আদরের ছোট বোনের বেলায় তো ফাঁকি মোটেই চলবে না | তাছাড়া আমার বোন নিজেই অত্যন্ত শিল্পমনা | তার আধুনিক সহপাঠীরাও সবাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে স্বাধীনচেতা এবং যথেষ্ট সৃজনশীল ও স্মার্ট | সাজগোজে সবাই এক নম্বর | যাইহোক, ছোট বোনের আবদার তো ফেলা যাবে না | বোনের আর এক শর্ত ছিল যে সাজাবার সময় আর কারো সাহায্য ছাড়া এবং তারই পছন্দমতো সাজাতে হবে | বিয়েবাড়িতে কে এল, কে গেল, কে কী খেল, কী খেল না, কার কী মতামত এসব কিছুতে নজর দেওয়া যাবে না | ছোট বোনের এ আবদারও মেনে নিতে হ'ল | যাহোক, এবার কনে সাজাবার পালা | আমার উপর ছোট বোনের এত আস্থা দেখে মনে মনে খুবই আনন্দ হয়েছিল | তবুও বেশ নার্ভাস হয়েই দুরু দুরু বুকে সে যুগের প্রথম পাঁচতারা হোটেলের এক কামরায় আমার কনে সাজানোর আর এক পরীক্ষা শুরু হ'ল | অতি সাবধানে ও সযতনে বোনের পছন্দমতো তাকে সাজিয়ে বিয়ের মঞ্চে নিয়ে গেলাম | বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বোন আমাকে কোথাও যেতে দিল না | বোনকে সাজানোর কাজ সেরে, স্টেজে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে সারাদিনের পর ক্লান্তিতে আমার শরীরে অবসাদ নেমে আসছিল | এই অবস্থায় আমার সোনালী রঙের উঁচু হিলের জুতোর একটার হিল গেল খুলে; কোনমতে এক দারোয়ানের সাহায্যে তাতে দুটো পেরেক পুঁতে জুতোতে পা গলিয়ে অতি সাবধানে হাঁটাচলা করলাম |

বিয়ের অনুষ্ঠান, খাওয়াদাওয়া শেষে এল কন্যা বিদায়ের পালা | মনটা বিষণ্ন হলেও শরীর চাইছিল বাড়ি গিয়ে সটান বিছানায় শুয়ে পড়তে | কিন্তু হ'ল না | বোনের সুটকেস গুছিয়ে বিদায়ের প্রস্তুতি চলছে, এমন সময় বোন আমার হাত চেপে ধরে বলল যে ওই রাতে সে একা অপরিচিত শ্বশুরবাড়িতে যেতে চায় না | তাহলে এর বিকল্প কি? আমি যেন তার সাথে ওর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওকে সামলে দিয়ে তবে ফেরত আসি | এ প্রস্তাব শুনে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল | কিন্তু বোনের পরিস্থিতি বুঝে তার জন্য মায়া হ'ল | মনে পড়ল বহু বছর আগে আমার নিজের অবস্থার কথা | আমার তো আর বড় বোন ছিল না, আমাদের বাড়ির পুরনো কাজের লোকটি, যে আমাদের মানুষ করেছিল, সে আমার সাথে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আমাকে সাহায্য না করলে আমার কী অবস্থা হতো? তাই বোনের এই প্রস্তাবে রাজি হতেই হ'ল | আমার এই বোনের বিয়েও আমারই মতো বাবা মা'র পছন্দেই | পাত্র কলেজের বাইরে আড়াল থেকে লুকিয়ে একবারই মেয়েকে দেখার সুযোগ পেয়েছিল | বরের একান্নবর্তী পরিবারের কারো সাথেই বোনের কোনো বিবাহপূর্ব সাক্ষাৎ পরিচয়ও ঘটেনি | এসব কথা চিন্তা করে বোনের জন্য এ অনুরোধটাও মেনে নিতে রাজি হলাম | ছোট বোনের সব আবদার রক্ষা করে, তার বেশ পরিবর্তন করে পরিশ্রান্ত হয়ে

রাতের শেষ প্রহরে বাড়ি ফেরার সুযোগ হ'ল।

বোনের কাছে পরে শুনেছিলাম তার বর তার বধূবেশ এত তাড়াতাড়ি বদলে ফেলায় নাকি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিল। তার ইচ্ছে ছিল নতুন বৌ পুরো রাতই কনের সাজে থাকবে। কী মুশকিল! আমি তো সে কথা না জেনে বোন যেভাবে চেয়েছে সেভাবেই ওকে তৈরী করে দিয়েছি।

এর পরের কনে সাজাবার যে বিশাল দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হ'ল, তা মেটাতে গিয়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনার মোকাবিলা করতে হয়েছে, শোনাই সে কাহিনী। সে কী ভীষণ হৈহট্টগোল! শুনেছিলাম এক হাজার কথা বিনিময় না হলে নাকি কোনো বিয়ে সম্পন্ন হয় না। এবার এ কথার সত্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম।

আমার ছোটবোনকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে মা বাসায় খুব একা বোধ করতেন। আমার ছোট ভাইয়ের জন্য তখন তিনি আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে থেকেই একটি পছন্দমতো মেয়ে খুঁজে পেলেন। শান্তশিষ্ট, সুশ্রী মেয়ে। কিন্তু পাকা দেখার দিন সুন্দর মেয়েটিকে তারা যেভাবে সাজিয়ে বসিয়েছিল, তা আমার মায়ের মোটেই পছন্দ হয়নি। তাই মা মেয়ের পরিবারের কাছে বিয়ের দিন কনেকে আমার হাতে সাজাবার অনুমতি চাইলেন। ঘোর নিয়মবিরুদ্ধ প্রস্তাব। কেউ কি কখনো শুনেছে যে বরপক্ষের লোক বিয়ের আগে কনের বাড়িতে গিয়ে তাকে সাজিয়ে এসেছে? আমার মায়ের সেই অসামাজিক আবদার অবশ্য কনেপক্ষ চুপচাপ মেনে নিয়েছিল।

কনের বাসায় সকাল থেকে গিয়ে হাজির হলাম। ওদিকে কনের বাড়িতে এ ধরনের অভূতপূর্ব ব্যবস্থার সমর্থক ও অসমর্থকের দুটো বৈরী দল সৃষ্টি হয়ে গেল। কনের মা-বোনরা বরপক্ষকে অসন্তুষ্ট না করার উদ্দেশ্যেই এরকম প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তা মানবে কেন? তারা এ ব্যবস্থায় দারুণ অপমান বোধে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন। এই হট্টগোলের মাঝে পড়ে আমার বিব্রত অবস্থা বুঝতে পেরে কনের বড় বোন আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে কনের ঘরে বসাল। ইতিমধ্যে প্রবীণরা পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন; তবে বিয়েবাড়ির আনন্দময় পরিস্থিতিটা আর ফিরে পাওয়া গেল না।

এরকম গৃহযুদ্ধের মাঝে কনে সাজাতে বসে কনের আর আমার দুজনেরই অস্বস্তিকর অবস্থা। শান্তশিষ্ট কনের মনে কী চলছে বোঝা কঠিন ছিল না। আমার ভাই সহজ সরল সাধারণ রুচির মানুষ। কাজেই কনেকে রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে সবার সামনে উপস্থিত করতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বিবাহ শেষে বর-বৌ নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। এর আগে বিয়ের রাতে আমার ছোট বোনের সাজসজ্জা পরিবর্তনের পর ছোট ভগ্নিপতির মন্তব্য আমার মনে ছিল। তাই এবার বাসর ঘরে কনেকে তার পুরো সাজপোশাকসহ ভাইয়ের অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পরদিন শুনলাম আমার ভাইয়ের নাকি কনেকে বিয়ের সাজে বাসরে বসে থাকতে দেখে অস্বস্তি বোধ হয়েছিল।

আমার কপাল!

এই তো গেল আমার কনে সাজানোর অভিজ্ঞতা ও উন্নতির ইতিহাস। প্রথম কথা নানা মুনির নানা মত থাকেই। পরিবারের সবাইকে একই নিয়মে সন্তুষ্ট রাখা যায় না। তাই বলি কি অনেক হ'ল; আর যাব না কনে সাজাতে। আমি তো আর কনে সাজিয়ে পয়সা রোজগার করতে চাই না। আত্মীয়-বন্ধুর অনুরোধে তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যই এই কাজ করা। আজকের দিনে অজস্র পার্লার খুলে গেছে। সেখানে তারা যেভাবে সাজাবে সাজাক। তবে আমার মতে কনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য একটু ধোয়ামোছা করে, সামান্য প্রসাধনে হাইলাইট করে দিলেই তো কত সুন্দর দেখায়! শুধু এক রাতের জন্য এক নতুন চেহারা তৈরী করে আজীবন কি কেউ তা ধরে রাখতে পারে?

আশাকরি কেউ আমাকে মেক-আপ আর্টিস্ট মনে করবেন না। আমার সাজানোর মান নিতান্তই প্রাচীন এবং অত্যন্ত সাধারণ। আজকালকার প্রসাধনের সঙ্গে আমি একেবারেই পরিচিত নই। তাই আমার অপারগতা স্বীকার করে বাকি জীবন প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই।

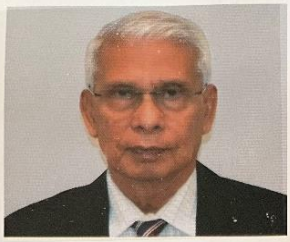

শেলী শাহাবুদ্দিন মূলত একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সাময়িকীতে প্রকাশিত চিকিৎসা-গবেষণা বিষয়ে প্রকাশনার তিরিশের অধিক। বাংলায় লেখালেখির আগ্রহ শৈশব থেকে। শুরুটা বিভিন্ন সংকলনে।

পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অধুনালুপ্ত বিখ্যাত সাহিত্য সাপ্তাহিক 'সচিত্র সন্ধানী'র নিয়মিত লেখক ১৯৮৫ সাল থেকে।

আমেরিকায় অভিবাসী হয়ে আসেন ২০০১ সালে। হিউস্টন থেকে প্রকাশিত দ্বিবার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাস-বন্ধু'র নিয়মিত লেখক ২০০৭ থেকে। ওহাইও থেকে প্রকাশিত অধুনা-লুপ্ত সাহিত্য পত্রিকা মাসিক 'দু-কূল'-এর নিয়মিত লেখক ২০১৪ থেকে। বৃহত্তর ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী 'স্বদেশ-শৈলী'র নিয়মিত লেখক ২০১৬ থেকে। বৃহত্তর ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল প্রকাশনা 'নাগরিক'-এর নিয়মিত লেখক অক্টোবর ২০১৮ থেকে। আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সম্মেলন সংকলনের নিয়মিত লেখক।

শেলী শাহাবুদ্দিন প্রবন্ধ ও গল্প লেখেন বিভিন্ন বিষয়ে। তাঁর অল্প কিছু কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। লেখার বিষয় প্রধানত মুক্তিযুদ্ধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং ভ্রমণ। উল্লেখযোগ্য রচনা : মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের জীবনী 'অনিকেত নক্ষত্রের আলো' (শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মারকগ্রন্থ। সম্পাদনা-বেগম সুফিয়া কামাল। ৯০ কলাবাগান দ্বিতীয় লেন, ধানমন্ডি থেকে শাহেদা পারভীন প্রকাশিত), এবং লিবিয়া প্রবাসের স্মৃতি নিয়ে লিখিত 'তেলের দেশে পাঁচ বছর' গ্রন্থ (তেলের দেশে পাঁচ বছর। সম্পাদক শাহাবুদ্দিন। ৯০ কলাবাগান দ্বিতীয় লেন, ধানমন্ডি থেকে শাহেদা পারভীন প্রকাশিত)।

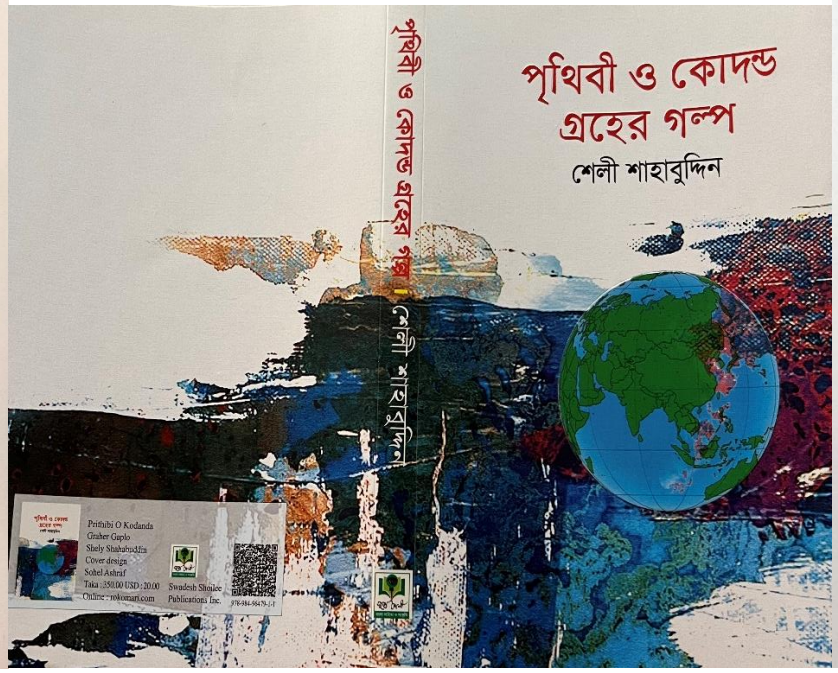

গল্প, কিন্তু গল্প নয়। গল্পের ভেতরে আছে বাস্তবতা। যেমন, অধ্যাপক রেনেসাঁ চৌধুরী যখন কোদন্ড গ্রহ আবিষ্কার করেন, তখন তাকে কল্পকাহিনি বলাই উচিত। কিন্তু পৃথিবীর পাঠক বুঝতে পারে কোদন্ড গ্রহ আছে। যেখানেই হোক আছে। পাঠক তখন কোদন্ড গ্রহের বাস্তবতা মেনে নেয়।

শেলী শাহাবুদ্দিন বাস্তব জীবনে যা দেখেন তাই-নিয়ে লেখেন তাঁর গল্প। গল্প বলাটা তাঁর আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য জীবনের কিছু বিরল অভিজ্ঞতা সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়া।

এই গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা নিয়ে আছে দুটি গল্প। বাঙালির ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ একদিকে কিংবদন্তির চাইতে ভয়াবহ, অন্যদিকে রূপকথার চাইতে রূপময় এক স্বপ্নের অর্জন। মহাকাব্যের উপাদান নিহিত এই মুক্তিযুদ্ধের বহু অজানা বাস্তবতার অসংখ্য গল্পের অন্তর্গত এই দুটি গল্প। আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে এমন লক্ষ লক্ষ ঘটনা। আজও রচিত হয়নি বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্য।

সাম্রাজ্যবাদের দ্বিচারিতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আছে কয়েকটি রম্যরচনা। আছে মহৎ মধুর শৈশব স্মৃতির বাস্তব কাহিনি। প্রেম, প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে রচিত বাকি গল্পগুলিও বাঙালির বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনি। যেমন ঐতিহাসিক ১২ নভেম্বরের বাস্তব ঘটনা নিয়ে রচিত 'চরুয়া ও সমুদ্র' গল্প। যে উপকূলের মানুষদের উপেক্ষা করে চরুয়া বলা হয়, বাস্তবে তারা অনেকেই পৃথিবীর যে-কোনো মহৎ মহানায়কের সমকক্ষ।

সবশেষে আছে লেখকের চিকিৎসক দৃষ্টিতে বর্তমান মহামারি নিয়ে কল্পিত এক সম্ভাবনার গল্প। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলে মহামারির চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে আজ পৃথিবীর মানুষের মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আর রাজনৈতিক রেষারেষি চলছে, তার অবসান না হলেও হয়তো তা প্রশমিত হবে।

সব মিলিয়ে তাই পৃথিবী ও কোদন্ড গ্রহের গল্প আসলে সমকালীন ব্যক্তিজীবন, সমাজ, ও ইতিহাসের এক দৈবচয়ন।

প্রকাশ পেল প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের সভ্য শ্রী শেলী শাহাবুদ্দিনের নতুন বই "পৃথিবী ও কোদন্ড গ্রহের গল্প"।
তাঁর এই কোদন্ড গ্রহের প্রাসঙ্গিক গল্প "কোদন্ড গ্রহে কুকুন্ড ভাইরাস"
প্রবাস বন্ধুর 2021-এর নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল।
এই লেখকের কাছ থেকে আমরা নানারকম রচনা উপহার পাই প্রবাস বন্ধু পত্রিকার নববর্ষ আর শারদীয়া সংখ্যায়।
সবরকম লেখায় তাঁর পারদর্শিতা লক্ষ্যণীয়।
শ্রী শাহাবুদ্দিনকে প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৯ (2022)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word-**এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর এক মাস আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ বিজয়া